শোকাবহ
আগস্ট
২০২৩

চিরঞ্জীব মুজিব

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
ঢাকা কেন্দ্র

শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকা-১০০০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ

প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর এফ/০৬১০০
মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আইইবি

উপদেষ্টামন্ডলী

প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন এফ/০৫৩২৪
মাননীয় চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র

প্রকৌশলী এস.এম. মনজুরুল হক মঞ্জু এফ/০৭৭৫৫
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি

প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার এফ/০৭৭৮৮
ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি

সম্পাদনা পরিষদ

প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম এফ/০৫৭৭৭
সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র

প্রকৌশলী শেখ মাছুম কামাল এফ/০৭৬৫৯
ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র

প্রকৌশলী হাবিব আহমদ হালিম (মুরাদ) এফ/০৮৬৯৯
ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র

প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী এফ/১০০০০
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি

প্রকৌশলী এ.এস.এম. সাখাওয়াত ইসলাম এম/৩৩৪৫৯
কাউন্সিল সদস্য, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

৩১ শ্রাবণ ১৪৩০
১৫ আগস্ট ২০২৩

বাণী

আজ ১৫ আগস্ট। ১৯৭৫ সালের এ দিনে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্যের নির্মম বুলেটের আঘাতে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে শাহাদত বরণ করেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একই সাথে শহিদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেল, একমাত্র সহোদর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, কৃষকনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল হক মণিসহ অনেক নিকটাত্মীয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আমি ১৫ আগস্টের সকল শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা ও মহান স্বাধীনতার রূপকার বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। ১৯৪৮ সালে ভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২ এর মহান ভাষা আন্দোলন, '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬২ এর গণবিরোধী শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬ এর ৬ দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও '৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে অমানবিক নির্যাতন।

মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধিকারের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপসহীন। ফাঁসির মঞ্চেও তিনি বাংলা ও বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু অসীম সাহসিকতার সাথে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর ঐ ভাষণে বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে গেঁথে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", যা ছিল মূলত স্বাধীনতারই ডাক। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। ঘাতকচক্র জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তাঁর নীতি ও আদর্শকে মুছে ফেলতে পারেনি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতির পিতার নাম এ দেশের লাখো কোটি বাঙালির অন্তরে চির অমলিন, অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বঙ্গবন্ধু আজীবন সাম্য, মৈত্রী, গণতন্ত্রসহ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি ছিলেন বিশ্বে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের স্বাধীনতার প্রতীক, বাঙালির মুক্তির দূত। ১৯৭৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে তিনি বলেন, "বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত—শোষক আর শোষিত; আমি শোষিতের পক্ষে"।

চলমান পাতা-০২

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর নীতি ও আদর্শ বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের অধিকার আদায়ে এবং শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণজাগরণে সবসময় অনুপ্রেরণা যোগাবে। বঙ্গবন্ধু এ দেশের লাখো-কোটি বাঙালিরই শুধু নয়, বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্যও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবেন।

বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। এ লক্ষ্যে স্বাধীনতার এক বছরের মাথায় তিনি প্রণয়ন করেন একটি গণমুখী সংবিধান। বঙ্গবন্ধু শুধু একটি দেশই উপহার দেননি; তিনি সদ্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো কেমন হবে তারও একটি যুগোপযোগী রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সবসময় জনগণের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখতেন। উন্নয়ন ও স্ব-নির্ভরতা অর্জনে তিনি মানুষের কর্মদক্ষতা, একতা ও যৌথ প্রচেষ্টাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। বঙ্গবন্ধুর দেখানো সেই পথে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে স্বনির্ভর দেশ গড়ার লক্ষ্যে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হয়েছে। দেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে তিনি ঘোষণা করেছেন 'রূপকল্প-২০৪১'। দিন বদলের রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশ উপহার দেয়ার পর দেশকে উন্নত, সুখী-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট-বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং সে লক্ষ্যে নিরলস পরিশ্রম করছেন। সেই ধারাবাহিকতায় গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প। বাংলাদেশের উন্নয়নের অনন্য মাইলফলক পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল ইতোমধ্যে জনগণের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। পায়রা সমুদ্রবন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, কর্ণফুলী টানেলসহ আরো কয়েকটি মেগা প্রকল্পের কাজ খুব শীঘ্রই শেষ হবে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হবে। সে লক্ষ্যে জ্ঞান-গরিমায় সমৃদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করাই এখন আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। তাহলেই চিরঞ্জীব এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। আসুন, জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির পিতা হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করি এবং তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে নিজেদের আত্মনিয়োগ করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩১ শ্রাবণ ১৪৩০
১৫ আগস্ট ২০২৩

বাণী

১৫ আগস্ট আমাদের জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে ঘাতকরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে।

জাতির পিতার সহধর্মিনী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন পুত্র- বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, দশ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, একমাত্র সহোদর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, কৃষকনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বেবী সেরনিয়াবাত, আরিফ সেরনিয়াবাত, সাংবাদিক শহিদ সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু ও আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে ঘৃণ্য ঘাতকরা এ দিনে হত্যা করে। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল এবং কর্তব্যরত পুলিশের বিশেষ শাখার এএসআই সিদ্দিকুর রহমান নিহত হন। ঘাতকদের কামানের গোলার আঘাতে মোহাম্মদপুরে একটি পরিবারের বেশ কয়েকজন হতাহত হন। জাতীয় শোক দিবসে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ১৫ আগস্টের সকল শহিদকে এবং তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

জাতির পিতার দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন সমগ্র জাতিকে নিয়ে সোনার বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র তাঁকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ হত্যা করে। এই হত্যার মধ্য দিয়ে তারা বাঙালি জাতির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। ঘাতকদের উদ্দেশ্যই ছিল অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেঙে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ভূলুণ্ঠিত করা। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতাবিরোধী চক্র '৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর থেকেই হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। তারা ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করে জাতির পিতার হত্যার বিচারের পথকে বন্ধ করে দেয়। জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে; সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে; হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করে; বিদেশে দূতাবাসে চাকুরি দেয়। স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের নাগরিকত্ব দেয়; রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করে; রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করে। পরবর্তী অবৈধ সামরিক সরকার এবং বিএনপি-জামাত সরকারও একই পথ অনুসরণ করে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর সরকার গঠন করে জাতির পিতার হত্যার বিচার শুরু করে। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে এই হত্যার বিচার কাজ বন্ধ করে দেয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পুনরায় বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর রেখে যাওয়া অচলাবস্থা এবং বিশ্বমন্দা কাটিয়ে দেশকে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করে। গত সাড়ে ১৪ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। এই সময়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। আমাদের সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে আমরা জাতির পিতার হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছি। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। আশা করি, জাতির পিতার হত্যার ষড়যন্ত্রের পেছনে কারা ছিল সেটাও একদিন বের হয়ে আসবে। জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচারও সম্পন্ন হয়েছে। একাত্তরের মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আমাদের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করছে। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের সুযোগ বন্ধ হয়েছে।

ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং গণতন্ত্র-উন্নয়ন বিরোধী চক্র এখনও দেশে-বিদেশে নানাভাবে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। এই অপশক্তির যে কোন অপতৎপরতা-ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করে দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে আমি দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

আসুন, আমরা জাতির পিতা হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করি এবং সকল চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে সকলে মিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি- জাতীয় শোক দিবসে এই হোক আমাদের সুদৃঢ় অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রেসিডেন্ট
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)

evbx

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে বাঙালি জাতির শোকাবহ দিন ১৫ আগস্ট উপলক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে **"চিরঞ্জীব মুজিব"** নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, এই মহতী উদ্যোগের সাথে জড়িত সকল প্রকৌশলীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, বাঙালি জাতির রুপকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুনন্নেছা মুজিব সহ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের। সেই সাথে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে। স্মরণ করছি প্রকৌশলী মরহুম আব্দুল জাব্বারসহ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যাঁরা এ প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান উন্নতিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলকে।

বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। তিনি ইতিহাসের মহানায়ক। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তাঁরই নেতৃত্বে বাঙালি জাতি অর্জন করে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, **১৯৫৮ এর সামরিক** শাসন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ছয় দফা, ১৯৬৯ এর গণ আন্দোলন, ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনসহ এ দেশের গণমানুষের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি বাঙালি জাতিকে নেতৃত্ব দেন।

বঙ্গবন্ধুকে দৈহিকভাবে হত্যা করা হলেও তার মৃত্যু নেই। তিনি চিরঞ্জীব। কেননা একটি জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্থপতি তিনিই। যতদিন এ রাষ্ট্র থাকবে, ততদিন অমর তিনি। সমগ্র জাতিকে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় প্রস্তুত করেছিলেন ঔপনিবেশিক শাসক-শোষক পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তাই চিরঞ্জীব তিনি এ জাতির চেতনায় বঙ্গবন্ধু কেবল একজন ব্যক্তি নন, এক মহান আদর্শের নাম। যে আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিল গোটা দেশ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনে দেশের সংবিধানও প্রণয়ন করেছিলেন স্বাধীনতার স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। শোষক আর শোষিতে বিভক্ত সেদিনের বিশ্ববাস্তবতায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন শোষিতের পক্ষে।

আইইবির ঢাকা কেন্দ্রের সব সময়ই সময়োপযোগী ও সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক দিবসগুলো পালন করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার ১৫ আগস্ট শোক দিবস উপলক্ষে চিরঞ্জীব মুজিব নামে একটি স্মরনিকা প্রকাশ করছে, যা সত্যিই অনেক গর্বের।

চিরঞ্জীব মুজিব সংকলন দেশের প্রকৌশলী সমাজকে সাহস দিবে, অনুপ্রেরণা দিবে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের সফল প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার পাশে থেকে স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণ সহায়তা করবেন এই প্রত্যাশা করছি।

আমি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ঢাকা কেন্দ্রের শোকাবহ আগস্ট উপলক্ষে সার্বিক কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর

সম্মানী সাধারণ সম্পাদক
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন,বাংলাদেশ (আইইবি)

evbx

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে শোকাবহ ১৫ আগস্ট উপলক্ষে **চিরঞ্জীব মুজিব নামে** একটি সংকলন প্রকাশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি,মুক্তিযুদ্ধের মহান নায়ক,জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। একই সাথে স্মরণ করছি ১৫ আগস্ট ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত সকল শহীদদের ও ৩রা নভেম্বর জেলে নিহত জাতীয় চার নেতাকে। স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সকল বীরসেনাদের যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ পেয়েছে একটি মানচিত্র ও একটি পতাকা। স্মরণ করছি, বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান আইইবি **১৯৪৮** সালের ৭ মে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সকল নিহত প্রকৌশলীদের।

আইইবির কেন্দ্রীয় কমিটির পাশাপাশি অন্যতম প্রাচীন ঢাকা কেন্দ্র বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে যে অবদান রেখে আসছে তা প্রশংসনীয়। অতীতের মতো এবারো শোকাবহ আগস্ট মাস পালন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাথে যৌথভাবে ঢাকা কেন্দ্রের নানা কার্যক্রম নিয়েছে।

আগস্ট এলেই কোটি কোটি বাঙালি শোক ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করে তাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় বঙ্গবন্ধুকে ঠাঁই দেন। জাতির পিতাকে হত্যা করেও বাঙালির কাছ থেকে তাকে আলাদা করতে পারেনি ঘাতকরা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবি শামসুর রহমান তার ধন্য সেই পুরুষ কবিতায় লেখেছেন- "ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর রৌদ্র ঝরে চিরকাল, গান হয়ে নেমে আসে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা; যাঁর নামের ওপর কখনো ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া, ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পাখা মেলে দেয় জ্যোৎস্নার সারস, ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পতাকার মতো দুলতে থাকে স্বাধীনতা, ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর ঝরে মুক্তিযোদ্ধোদের জয়ধ্বনি"। ত্যাগ, সংগ্রাম, বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্ব, অদম্য স্পৃহা, দৃঢ় প্রত্যয়, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও আদর্শের দ্বারা বঙ্গবন্ধু সমগ্র বাঙালি জাতিকে উজ্জীবিত করেছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান চিরঞ্জীব। বাঙালি জাতির অনুপ্রেরণা। তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী হয়ে সফলতার সাথে রাষ্ট্র পচিালনা করছেন বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। যিঁনি প্রকৌশলী সমাজের আশার বাতিঘর, আলোর দিশারী এবং স্মার্ট বাংলাদেশের রুপকার।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি চিরঞ্জীব মুজিব সংকলনের মাধ্যমে দেশের প্রলকৌশলীরা অনেক অজানা তথ্য পাবেন, পাশাপাশি আগামীতে রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার হাত শক্তিশালী করার মন্ত্র পাবেন। চিরঞ্জীব মুজিব সংকলনের সাথে জড়িত আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সকল প্রকৌশলীদের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু

চেয়ারম্যান
আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র

evbx

বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক কলঙ্কজনক বেদনাবিধুর দিন। এই কালো রাত্রিতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে আমাদের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা আর ইতিহাসের উপর এক কলংকজনক অধ্যায় রচিত হলো। জেঁকে বসল জগদ্দল পাথরের ন্যায় সামরিক জান্তা। ঘৃণ্য ঘাতকেরা এই দিনে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধু সুলতানা কামাল ও রোজী জামালসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকেও হত্যা করে।

১৯৭১ সালের দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি স্বাধীনতার সুফল ঘরে তুললো। বাঙালি পেয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র, নিজস্ব পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত। আর স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আর একবার বাঙালির ভাগ্যে চরম বিপর্যয় ঘটলো। বাঙালি হারালো জাতির পিতাকে, গণতন্ত্রকে। জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে বাঙালির ললাটে আরও এক কলঙ্কজনক অধ্যায় যোগ হলো।

সেই কলঙ্কের দাগ ঘোচাতে এবং গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে একুশ বছর সংগ্রাম আর ত্যাগ স্বীকার করতে হলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের ১৬ জুন অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি পুনরায় ক্ষমতায় আসলো এবং শুরু হলো দেশ গড়ার নতুন সংগ্রাম। অতপর বিগত ১৫ বছরে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে বিশ্বের বুকে অনন্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল।

উন্নত আধুনিক বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত ভিশন ২০২১, ভিশন ২০৪১ এবং ডেল্টা ২১০০ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকৌশলীরাই প্রথম সারির যোদ্ধা। বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা যার যার অবস্থান থেকে সততা, নিষ্ঠা, সুনাম ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সূচিত উন্নয়ন কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর ৪৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের স্মরণিকা প্রকাশে যাঁরা নিরলস শ্রম, মেধা ও সময় দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাচ্ছি অভিনন্দন, আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন

ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি)
আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র

ï‡f"Qv

বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের আরেক নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন সমৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি ও উন্নতির যুদ্ধ। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে দেশকে গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজ সম্পাদন করে বঙ্গবন্ধু সূচনা করেছিলেন "অর্থনৈতিক মুক্তি" অর্জনের সংগ্রাম।

বঙ্গবন্ধুর এই উদ্যোগকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল মুক্তিযুদ্ধবিরোধী দেশী ও আন্তর্জাতিক অপশক্তি। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট এই অপশক্তির চক্রান্তে সপরিবারে শহীদ হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু মৃত্যুঞ্জয়ী। তাঁর মতো সুবিশাল ও সুমহান ব্যক্তিত্বকে ইতিহাস থেকে কখনও মুছে ফেলা সম্ভব নয়। বর্তমানে তাঁর অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো পূরণে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যার সুযোগ্য নেতৃত্বে লক্ষ্য অর্জনের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ভিশন- ২০২১ ও ভিশন- ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, দারিদ্র ও শোষণমুক্ত বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ দেশের প্রকৌশলীরা নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দিয়ে যাবে, এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের স্মরণিকা প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে জানাচ্ছি অসীম কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রকৌশলী শেখ মাছুম কামাল

ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ)
আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র

i‡f"Qv

১৫ আগস্ট জাতীয় শোকের দিন। বাংলার আকাশ-বাতাস আর প্রকৃতির অশ্রুসিক্ত হওয়ার দিন। কেননা পঁচাত্তরের এই দিনে সুবেহ সাদিকের সময় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে নিজ বাসভবনে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে বুলেটের বৃষ্টিতে ঘাতকরা ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। ঘাতকদের উদ্যত অস্ত্রের সামনে ভীতসন্ত্রস্ত বাংলাদেশ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল শোকে আর অভাবিত ঘটনার আকস্মিকতায়। কাল থেকে কালান্তরে জ্বলবে এ শোকের আগুন। ১৫ আগস্ট শোকার্দ্র বাণী পাঠের দিন।

জাতির পিতার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে নিয়ে সোনার বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতা বিরোধী-যুদ্ধাপরাধীচক্র তাকে হত্যা করে। এই হত্যার মধ্য দিয়ে তারা বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়।

১৯৯৬ সালে দীর্ঘ ২১ বছর পর জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসেন। অতীতের জঞ্জাল সরিয়ে দেশে আর্থসামাজিক উন্নয়নের এক নবদিগন্তের সূচনা হয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে দেশরত্ন শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর রেখে যাওয়া অচলাবস্থা এবং বিশ্বমন্দা কাটিয়ে দেশকে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করেন। গত ১৫ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে 'রোল মডেল'। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে এ দেশের প্রকৌশলীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করে আমরা প্রকৌশলীরাই এই দেশকে 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায়' পরিণত করব এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকার জন্য যাঁরা নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রকৌশলী হাবিব আহমদ হালিম (মুরাদ)

সম্মানী সম্পাদক
আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র

সম্পাদকীয়

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। জাতীয় শোক দিবসে আমি শোকাহত চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা জানাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি।

বাঙালি জাতির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। ইতিহাসের এই মহানায়কের নেতৃত্বে ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি অর্জন করেছে তাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অর্জন- স্বাধীনতা। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ছয় দফা, ১৯৬৯ এর গণ আন্দোলন, ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনসহ এ দেশের গণমানুষের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি বাঙালি জাতিকে নেতৃত্ব দেন।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যখন বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সোনার বাংলা গড়ার কাজে মগ্ন, তখনই তাঁকে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি বাঙালির সকল অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়।

১৯৯৬ সালে ২১ বছর পর জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি ক্ষমতায় আসলো এবং শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রাম। ২০০৮ সালে পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাঙালি জাতি। সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন একটি বড় অর্জন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানীমূখী শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, রপ্তানী আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়েছে। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে "উন্নয়নের রোল মডেল" এবং এ দেশের প্রকৌশলীরাই এই উন্নয়নের মূল কারিগর।

বঙ্গবন্ধুর ৪৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক এই স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগের সাথে জড়িত প্রকাশনা কমিটি সকল সদস্যদের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ দৃশ্যমান
চলছে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম

অধ্যাপক ড. মো.হোসেন মনসুর
চেয়ারম্যান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

ঠান্ডা লড়াই ও বঙ্গবন্ধুর বিদেশ নীতি

জাতীয় শোকের মাস আগষ্ট। এই মাসের আগমন ঘটলেই বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। আগষ্ট মাসের সূচনা ভলোভাবেই ঘটেছিল। আগষ্ট মাসের ৫ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ছেলে, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শহীদ শেখ কামাল সর্বপ্রথম চোখমেলে পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন। এই আগস্ট মাসের ৮ তারিখে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জন্মগ্রহন করেছিলেন।জাতীর পিতার দূরদর্শিতায় শেভরণের নিকট থেকে নাম মাত্র মূল্যে পাচঁটি বড় বড় গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয় করার চুড়ান্ত চুক্তিটি এই আগষ্ট মাসের ৯ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। এ সকল উজ্জ্বল আনন্দের দিন গুলো ম্লান করে বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও কলঙ্কজনক অধ্যায় রচিত হয় ১৫ আগষ্টের উষালগ্নে, যখন কতিপয় বিপথগামি সেনাকর্মকর্তা দেশি-বিদেশি চক্রান্তের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করে। এই আগষ্ট মাসের ১৭ তারিখে তৎকালিন বিএনপি সরকারের মদদপুষ্ট উগ্র জঙ্গিরা বাংলাদেশের ৬৩ জেলায় ৫৬৫ টি বোমা ফাটিয়ে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ আওয়ামীলীগকে চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য তৎকালিন বিএনপি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এ মাসের ২১ তারিখে আরোও একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় রচিত হয় ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিন্যুতে গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে। শোকের মাস উপলক্ষে আমার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুরা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু লিখতে বলেছেন। তাই আমার এই লেখা যার শিরোনাম **,'ঠান্ডা লড়াই ও বঙ্গবন্ধুর বিদেশ নীতি'**। প্রথমেই আমি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন ক্ষণজন্মা। জন্মের পরই হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দ্বারাই পূর্ব বাংলা স্বাধীন হবে। তাই তিনি নিজেকে সেভাবেই গড়ে তুলেছিলেন। বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপট মাথায় নিয়েই তিনি ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেজন্যই বিদেশ নীতি ঠিক করতে তাঁর কারোও নিকট থেকে পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন হয়নি। তাঁর বিদেশ নীতি আলোচনা করার আগে আমি একটু বৈশ্বিক রাজনীতি ও মেরুকরণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে চাই।

সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর বিশ্বে দ্বিমেরুকরণ রাজনীতির জন্ম হয়। সারা বিশ্বের মেরুকরণ প্রক্রিয়ার বিষয় নিয়ে মার্কিন সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর The Cold War নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ঠান্ডা যুদ্ধ কথাটি ব্যবহার করেন। ঠান্ডা যুদ্ধের তিনটি পর্যায় আছে, যথা, ১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, ২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ও ৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে সাম্যবাদী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী জোট গঠনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে দ্বিমেরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক আগ্রাসনকে রুখতে আমেরিকার নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল ওয়াশিংটন ডিসিতে উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট বা ন্যাটো (NATO) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ন্যাটো একটি সম্মিলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা: যার অধীনে স্বাধীন পশ্চিমা ইউরোপীয় সদস্য রাষ্ট্রগুলো তৃতীয় পক্ষের আক্রমণ থেকে একে অপরকে রক্ষা করতে পারে। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ন্যাটোর সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় আর যেন সমাজতান্ত্রিক বিস্তার না ঘটে সেজন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সম্মিলিত প্রতিরক্ষার জন্য ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় স্বাক্ষরিত হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা চুক্তি (SEATO) ১৯৫৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে চুক্তি অংশীদারদের একটি সভায় এসইএটিও আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম লাভ করে। সংস্থাটির সদর দপ্তরও ব্যাংককে ছিল। আট জন সদস্য সংগঠনে যোগ দেন। প্রাথমিকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিজম বিস্তারকে বাধা দেওয়াই ছিল এ চুক্তির মূল লক্ষ্য। এখানেই আমেরিকা থেমে থাকেনি। সাম্যবাদের বিস্তার রোধে আরবের দেশগুলোকে রক্ষা এবং তেলের ভাণ্ডারকে রক্ষার জন্য আমেরিকা গঠন করেছিল সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন (সেন্টো বা CENTO)। এটি ১৯৫৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, তুরস্ক এবং যুক্তরাজ্য দ্বারা গঠিত হয়েছিল।

আমেরিকাকে পাল্লা দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৪ মে ১৯৫৫ সালে স্বাক্ষর করে করে ওয়ারশ চুক্তি (WARSAW) ও **ওয়ারশ** চুক্তি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সম্মিলিত প্রতিরক্ষা চুক্তি আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড এবং রোমানিয়া ছিল ওয়ারশ চুক্তির সদস্য রাষ্ট্রসমুহ। ওয়ার'শ চুক্তিটি ন্যাটোর ক্ষমতার ভারসাম্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ঠান্ডা লড়াই শুরু হওয়ার পর সারা বিশ্বে যখন টান টান অবস্থা তখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন বা নন **অ্যালায়েন্ড মুভমেন্ট বা ন্যাম** (NAM)। এটি হল একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্নায়ুযুদ্ধকালীন পুঁজিবাদী দেশসমূহের জোট ন্যাটো এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের জোট ওয়ারশ থেকে নিরপেক্ষ হিসাবে আন্দোলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে ১৮-২৬ এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯ টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঔপনিবেশিক শাসন ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পারমানবিক অস্ত্রের পরীক্ষা ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সেখান থেকেই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন পাঁচজন মহান ব্যক্তি, তাঁরা হলেন: ১। ভারতের পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ২। যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল জোসিফ ব্রোজ টিটো, ৩। মিশরের গামাল আবদেল নাসের, ৪। ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণো ও ৫। ঘানার কোয়ামে নক্রুমা। সকল প্রস্তুতি শেষে ১৯৬১ সালে পুরাতন যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে জন্ম হয় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বা ন্যাম।

বৈশিক রাজনীতির এমন একটি জটিল পরিস্থিতিতে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সামনে ছিলো অনেক চ্যালেঞ্জ। আমেরিকাসহ বিদেশি রাষ্ট্রগুলো থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায় ও তাদের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, জাতিসংঘ এবং ওআইসি-এর সদস্যপদ, আর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকসহ দাতা সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন। চারটি মূলনীতির উপর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তার একটি ছিলো সমাজতন্ত্র। স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতসহ সোভিয়েত ইউনিয়ন অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে। তৎকালিন মস্কোপন্থি বাম রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ বা সমর্থন দিয়েছে। তাই অনেকেই মনে করতেন সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ হয়তো সমাজতান্ত্রিক জোটভুক্ত হবে। সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক নামক কোন বলয়ে অন্তর্ভূক্ত না হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগদান করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি লন্ডনে পৌঁছান। পৌছেই তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে বৈঠক করেন। এরপর ১০ জানুয়ারি লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে দেশে ফেরেন। দিল্লীতে কয়েক ঘন্টা অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধুকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সহ মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য। সেদিন দিল্লীতে তাঁকে গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সেই ঐতিহাসিক সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন। তার আগমনের পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা হয়। বঙ্গবন্ধু বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর এই খ্যাতি দ্রুত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করেছিল। পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের পথ অনুসরণ করেছিলেন, আর তা'হলো 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়'। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ছিল জাতীয় নিরাপত্তা ও উন্নয়নের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তি নিশ্চিত করা এবং সারা বিশ্বে শান্তির বার্তা পৌছে দিয়ে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিনত করা। এক ভাষণে তিনি বলেন, 'আমি চাই, বাংলাদেশ প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডে পরিণত হোক। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূল বিষয়গুলো হলো- 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়' এবং 'বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান'। দেশের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ নিশ্চিত করতে এবং বিদেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বীকৃতি ও সহায়তা অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন। শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিটি কূটনৈতিক ইস্যু নিষ্পত্তি করার জন্য তিনি খুব ইতিবাচক ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে ছিল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা। তারই প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল ওআইসি সম্মেলনে। ১৯৭৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে আয়োজিত ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) সম্মেলনে সমকালীন মুসলিম বিশ্বের সমস্যা এবং সম্ভাবনা তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু এক যুগান্তকারী বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি বলেন, ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি, দুর্ভোগ নয়, মানুষের কল্যাণে আমাদের কাজ করতে হবে। তিনি আরোও বলেন, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ ও সব ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে একাত্মতার ওপর জোর দিতে হবে।

প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ভারত সফর করেন। সফরকালে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সব ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়। ভারত ১ মার্চ বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় এবং ১৫ মার্চের মধ্যে সকল ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। তিনি ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাঁচ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মস্কোর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর এবং কমনওয়েলথ সম্মেলনে অংশগ্রহণ বঙ্গবন্ধুর সফল পররাষ্ট্রনীতির আরেকটি বড় উদাহরণ। ১৯৭২ সালের ১৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তি বিষয়ক ২৫ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ আইএমএফ (১৮ মে), আইএলও (২২ জন্য, ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (২০ সেপ্টেম্বর), ইউনেস্কো (১৯ অক্টোবর), কলম্বো প্ল্যান (৭ নভেম্বর) এবং জিএটিটি (৯ নভেম্বর) এর সদস্য পদ লাভ করে। ২৩ আগস্ট যুক্তরাজ্য, ভারত,

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়া একটি যৌথ প্রস্তাবে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে জোরালো সুপারিশ করে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর অব শাসনামলে বাংলাদেশ কমনওয়েলথ অব নেশনস, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, অর্গানাইজেশন ইসলামিক কোঅপারেশনহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হয়।

বিশ্ব শান্তির দূত হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ-ভারত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি ১৯৭২, এই উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তি স্থাপনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ এবং শান্তি ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান গ্রহণের নীতির ফলে বাংলাদেশ বিশ্ব সভায় একটি ন্যায়ানুগ দেশের মর্যাদা লাভ করে। সবার প্রতি বন্ধুত্বের ভিত্তিতে বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি যে অর্থ ব্যয় করে মানুষ মারার অস্ত্র তৈরি করছে, সেই অর্থ গরিব দেশগুলোকে সাহায্য দিলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে। তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভায় বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলন এবং বিশ্ব শান্তির সপক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদানের জন্য শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশ চন্দ্র প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। পৃথিবীর ১৪০টি দেশের শান্তি পরিষদের ২০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৩ সালের ২৩ মে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উত্তর প্লাজায় উন্মুক্ত চত্বরে সুসজ্জিত প্যান্ডেলে বিশ্ব শান্তি পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক কূটনীতিকদের বিশাল সমাবেশে বিশ্ব শান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রদান করেন। এরপর তিনি বলেন, 'শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন, আজ থেকে তিনি বিশ্ববন্ধুও বটে।' বঙ্গবন্ধুর আগে যাঁরা 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফিদেল ক্যাস্ট্রো, হো চি মিন, ইয়াসির আরাফাত, সালভেদর আলেন্দে, নেলসন ম্যান্ডেলা, ইন্দিরা গান্ধী, মাদার তেরেসা, কবি ও রাজনীতিবিদ পাবলো নেরুদা, জওহরলাল নেহেরু, মার্টিন লুথার কিং, নিওনিদ ব্রেজনেভ প্রমুখ। ১৯৭৩ সালের ৫ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে চতুর্থ জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর যোগদান ছিলো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। একদিন আগেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ বিমানে করে তার প্রতিনিধি দলসহ আলজিয়ার্স বিমানবন্দরে পৌঁছান। বিমানবন্দরে ৯২টি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জাতীয় পতাকা উড়ছিল। শত ব্যস্ততার মাঝেও বিমানবন্দরে স্বয়ং উপস্থিত থেকে প্রেসিডেন্ট বুমেদীন দারুণভাবে সংবর্ধনা জানালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পরদিন সকালে স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিগুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধু- বুমেদীনের কোলাকুলির ছবি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য লাভ করেছিল। সে সম্মেলনে আরোও যোগদান করেছিলেন যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো; সৌদি আরবের বাদশা ফয়সাল, মরক্কোর বাদশা হাসান, ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসী, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদ, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন, তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট হাবিবর গুইবা, মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত, লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি, পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাত, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্ত, কাপুচিয়ার প্রিন্স রাদম সিহানুক, নাইজেরিয়ার জোমো কেনিয়াত্তা, উগান্ডার ইদি আমিন, কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো, নেপালের রাজা বীরেন্দ্র, শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েক এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অন্যতম। সম্মেলন উপলক্ষে ৬টি তোরণ নির্মান করা হয়েছিলো। এই ছয়জন মহান ব্যক্তির মধ্যে পাঁচজন হলেন জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মার্শাল জোসিফ ব্রোজ টিটো, গামাল আবদেল নাসের, সুকর্ণো ও কোয়ামে নমার নামে। ষষ্ঠ তোরণটি নির্মাণ করা হয়েছিল বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে। তাঁদের মধ্যে শুধু দু'জনই জীবিত ছিলেন - বঙ্গবন্ধু ও মার্শাল টিটো। ভাবতে অবাক লাগে যে বঙ্গবন্ধুকে তাঁরা সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন! আলজিয়ার্সের একমাত্র ইংরেজি পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রী মুজিব সম্পর্কে প্রায় এক পৃষ্ঠাব্যাপী বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছিল। এম আর আখতার মুকুল বঙ্গবন্ধুর সেই সফর নিয়ে তার বইতে বিস্তারিত লিখেছেন। সম্মেলনের শুরুতেই বিভিন্ন দেশের নেতাদের পরিচয় করিয়ে দেন সম্মেলনের সভাপতি ও আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদীন। একজন করে নেতা মঞ্চে এসে দাঁড়াবার পর প্রেসিডেন্ট বুমেদীন ক্ষুদ্র বক্তিতায় তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে হলে উপস্থিত সমস্ত প্রতিনিধিরা করতালির মাধ্যমে জানিয়েছিলেন উষ্ণ অভিনন্দন। পিএলও-প্রধান ইয়াসির আরাফাতের পরিচিতির সময় করতালি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের পরিচিতির পর সম্মেলন কক্ষে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাঙালি পোশাকে শ্বেতশুভ্র পাজামা-পাঞ্জাবি আর কালো মুজিব কোট পরিহিত প্রায় ছ'ফুটের এক হিমাচল সদৃশ ব্যক্তিত্ব শেখ মুজিব। মুখে শিশুর সরল হাসি। সম্মেলন কক্ষের প্রতিটি মানুষ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে করতালি দিচ্ছিলো, সে করতালি যেন আর থামার নয়। এভাবেই সেদিন বিশ্ব নেতারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে জানালেন হৃদয়ের প্রাণঢালা সংবর্ধনা। তিন মিনিটের বেশি সময় ধরে এক নাগাড়ে করতালির পর প্রেসিডেন্ট বুমেদীনের ইশারায় সবাই আবার নিজ আসনে বসে পড়েন। গর্বে উপস্থিত বাঙালিদের বুক ফুলে উঠেছিল। সেই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী ছিলেন অমর একুশে গানের রচয়িতা প্রয়াত সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী। বাংলা নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, ওই সম্মেলনে প্রথম বর্ণানুক্রমিকভাবে ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। সে হিসেবে কথা বলার ছিলো আফগানিস্তানের প্রতিনিধির। কিন্তু তিনি বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনতে চাই। এরপর বঙ্গবন্ধু বক্তিতা করেন। যা শুনে ফিদেল কাস্ট্রো ছুটে এসে বঙ্গবন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন তার অমর বাণী, 'আমি হিমালয় দেখিনি, আপনাকে দেখেছি। আমার আর হিমালয় দেখার দরকার নেই।' সৌদি আরবের কিং ফয়সাল যিনি মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর কাছে এসে বারবার বলেন, 'আমি লজ্জিত, আমি লজ্জিত'। আর এ সবকিছুর মূলেই ছিলো বঙ্গবন্ধুর অহিংস ও বন্ধুত্বের বিদেশ নীতি: 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়' এবং 'বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান'। তথ্য-উপাত্ত বিশ্বাসযোগ্য বিভিন্ন প্রবন্ধ, উইকিপিডিয়া ও পত্রিকা থেকে সংগৃহিত।

প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন
মহাপরিচালক
পাওয়ার সেল, বিদ্যুৎ বিভাগ ও চেয়ারম্যান,
আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র
এফ/০৫৩২৪

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত: বঙ্গবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা

বাংলাদেশ এবং জাতির সবটুকু অর্জনের সাথে মিশে আছে বঙ্গবন্ধু নামটি। আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের স্বপ্ন-মোট কথা জাতিসত্বার প্রতিটি কণায় কণায় তাঁর সরব উপস্থিতি বিরাজমান। অথচ ইতিহাসের এই মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে স্বপরিবারে হত্যা করে কতিপয় নরঘাতক। জাতির ইতিহাসে অঙ্কিত হয় এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। আগস্ট তাই আমাদের কাছে শোকের মাস, শক্তির মাস। ইতিহাসের চাকাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য চালানো হয়েছে এই নারকীয় হত্যাকান্ড। কিন্তু বাংলার জনগণকে বিস্মৃত করা যায়নি জাতির পিতার আদর্শ থেকে। তারা রুখে দাঁড়িয়েছে, প্রতিবাদ করেছে, খুনীদের বিচারের দাবীতে রাজপথ রঞ্জিত করেছে। যার ফলশ্রুতিতে আজ খুনীদের বিচার হয়েছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে আলোকিত অধ্যায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহবানে সাড়া দিয়ে এদেশের আপামর জনগণ পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বিজয়ের লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিল। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুণর্গঠনের জন্য তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে পুরোপুরি নিবেদিত করেছিলেন। তিনি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শুরু হয় যুদ্ধবিদ্ধস্ত ধ্বংসপ্রায় দেশ গঠনে জাতির পিতার দূরদর্শী নেতৃত্ব।

একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য তাঁর স্বপ্নটি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে প্রজাতন্ত্রের সংবিধান প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। জাতির পিতা বিদ্যুৎকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করে বেশ কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে বিদ্যুৎকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে বিদ্যুতের প্রাপ্যতা এদেশের সকল মানুষের সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার PO-৫৯ এর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ৩১ মে ওয়াপাদা-কে বিভাজন করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে বিদ্যুৎ খাতে এক নবদিগন্তের সূচনা করেন। ফলশ্রুতিতে সমগ্র দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্ব অর্পিত হয় পিডিবি'র উপর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সূদুর প্রসারী সিদ্ধান্তে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় সিদ্ধিরগঞ্জ, ঘোড়াশাল এবং আশুগঞ্জে পাওয়ার হাব প্রতিষ্ঠা করা হয়। লোড সেন্টার বিবেচনায় উক্ত পাওয়ার হাবসমূহ এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

শুধু তাই নয় ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ প্রকৌশলী সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণে বলেন যে, "বিদ্যুৎ ছাড়া কোন কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হইবে না"। তারই ফলশ্রুতিতে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করে জাতির পিতার নির্দেশনার আলোকে ১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড গঠিত হয়। যার ফলে তাঁর সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে দেশে আজ শতভাগ বিদ্যুতের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখ আহসান মঞ্জিলে জেনারেটরের সহায়তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে এই অঞ্চলে বিদ্যুতের যে যাত্রা শুরু হয় তখন থেকে ৭০ বছরে অর্থাৎ ১৯০১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা যেখানে ছিল ৫৪৭ মেগাওয়াট, সেখানে জাতির পিতার দূরদর্শী নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মাত্র সাড়ে তিন বছরে ২১৯ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ সংযোজনের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ৭৬৬ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডের পর স্বাধীনতা বিরোধী সরকার ক্ষমতায় থাকায় পরবর্তীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের আশাব্যঞ্জক কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি।

৭৫ এর পর দীর্ঘ ছয়টি বছর সীমাহীন কষ্টসাধ্য নির্বাসিত জীবন শেষ করে ১৯৮১ সালের ১৭ মে নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন জাতির পিতার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। সুদীর্ঘ ১৫ বছরের সংগ্রামের পর ১৯৯৬ এর নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশকে আবারো পুনরুজ্জীবিত করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার যাত্রা শুরু করেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১, সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ ধরে বিদ্যুৎখাতে এক নবযুগের সূচনা হয়। এই সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য "Private Sector Power Generation Policy of Bangladesh" গ্রহণ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রায় ৫০ ভাগ। বিদ্যুৎ খাত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় বিদ্যুৎ খাতের কাঠামোগত সংস্কার করে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণখাতে নানা সংস্থা ও কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে বিদ্যুৎখাতে সুশাসন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে একসময় বিদ্যুতের সিস্টেম লস ছিল ৩০% এর উপরে যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ৮% এর নিচে নেমে এসেছে।

পরবর্তীতে ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের ফলে ২০০১-২০০৮ সাল পর্যন্ত এ অগ্রগতির ধারা ব্যহত হয়। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত বিপর্যস্ত এবং স্থবির হয়ে পড়ে। প্রতিদিন ৮-১০ ঘন্টা লোডশেডিং ছিল নিত্তনৈমিত্তিক বিষয়। জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ আবারো মাথা উচুঁ করে উঠে দাঁড়াতে শুরু করে। ২০০৯ সাল- তখন বৈশ্বিক মন্দা বিরাজমান। এই ভয়াবহ অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিলেন দিন বদলের সনদ "রূপকল্প-২০২১"। তিনি ঘোষণা দিলেন ২০২১ সালের মধ্যে সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো হবে। বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে বাংলাদেশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিকে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। ২০২১ সালের পূর্বেই বিদ্যুৎ এখন সবার ঘরে পৌঁছেছে। বঙ্গবন্ধুর পদাংক অনুসরন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহনের পর পরই বিদ্যুৎখাতে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাৎক্ষণিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধির বিশেষ বিধান আইন প্রণয়ন ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ মেয়াদে আর একটি সাহসী ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এ আইনের আওতায় স্বল্পতম সময়ে যথা প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির মাত্র ৪ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়া সম্ভব হয়েছে; যা ছিল এককথায় অবিশ্বাস্য। এ অর্জনের আওতায় নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দেশের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ইওউঝ এর সমীক্ষায় দেখা গেছে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুতের ফলে প্রতি মিলিয়ন কিলো-ওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সামষ্টিক অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪৬ মিলিয়ন টাকা হতে ১০৭ মিলিয়ন টাকা (১৯৯৫/৯৬ এর মূল্যকে স্থির ধরে)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী, সাহসী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ফলে এক যুগে বিদ্যুৎ খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে- যা বিগত ১০০ বছরেও হয়নি। "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এ স্লোগানকে সামনে রেখে সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালের ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০০৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ২৩ হাজার ১৯২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। ফলে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ক্যাপটিভসহ ২৮ হাজার ১৩৪ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে যা সরকার গৃহীত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার পূর্বেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। বিদ্যুতের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী ইতোমধ্যেই ১০০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। তা'ছাড়া ১১ হাজার ৬০৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প নির্মাণাধীন, ২ হাজার ৪২৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষর এবং ৬২৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত ১০ হাজার ২৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সংরক্ষণ ও মেরামতের মাধ্যমে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সরকারের বিগত তিন মেয়াদে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১৪ হাজার ৭১৭ সার্কিট কিলোমিটার

এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৬ লক্ষ ২৯ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। **বিদ্যুতের সামগ্রিক সিস্টেম লস ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১৬.৮৫ শতাংশ হতে ৬.৫৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০.৩১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।**

আমরা এখন গ্রাহকগণকে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছি। উন্নত বিশ্বের ন্যায় আধুনিক সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছি। স্মার্ট গ্রিড, আন্ডার গ্রাউন্ড বিতরণ ব্যবস্থা এবং গ্রাহক সেবা নিশ্চিতে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। বঙ্গবন্ধুর পথ ধরে বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে আগামী দিনে দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আধুনিক বিশ্বের ন্যায় উন্নত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়ন ও অগ্রগতির "রোলমডেল"। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে দেশ আজ বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিসহ সব খাতেই এগিয়ে যাচ্ছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়িত হওয়ার পর বাংলাদেশ বর্তমানে "স্মার্ট বাংলাদেশ" বিনির্মাণের লক্ষ্যে পথ চলছে। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা'র স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হবে বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে দেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণ করা। তাহলেই তাঁর আত্মা শান্তি পাবে এবং আমরা এই মহান নেতার সোনার বাংলা বিনির্মানের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবো। আমাদের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত ঝউএ বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা এবং ডেলটা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়ন করা।

জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু!

প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি
এফ/০৭৭৫৫

বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন

বঙ্গবন্ধু প্রথম গ্রেফতার হন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে নবম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন, আটক রাখা হয় ঘন্টা দুয়েকের জন্য। এর পর ১৯৩১ সালে জীবনের প্রথম কারাবরণ ৭ দিনের জন্য। এই জেল খেটে তিনি মন্তব্য করেছিলেন," আমার নাবালকত্ব ঘুচেছে।" এই জেলের অভিজ্ঞতাই পরবর্তী জীবনে তাঁকে সংগ্রামী ও অদম্য সাহসী করে তোলে।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সৃষ্টি করে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের অমর দিনকে। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ শেখ মুজিব গ্রেফতার হন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ছাত্ররা মিছিল নিয়ে ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণকালে যে সব ছাত্র নেতা বন্দী হন, শেখ মুজিব ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

১৯৪৯ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বাঁচার সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নিলেন শেখ মুজিব এবং হলেন কারারুদ্ধ, সে সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ছাত্র। ১৯৪৯ সালে বাংলায় দেখা দেয় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ, হাজার হাজার লোক অনাহারে মারা যায় কিন্তু পাকিস্তানি সরকার সংকট সমাধানে উদাসীনতার পরিচয় দেয়।

আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫০ সালে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে মিলিত হয়ে নেতৃত্ব দেন ভুখা মিছিলে, উভয় নেতাই হন কারারুদ্ধ, শিশু পাকিস্তানের দুই বছরের মধ্যেই তাঁকে কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়। ১৯৫২ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। কারারুদ্ধ থাকাকালীনই তিনি ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি হতে ২৭ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ১২ দিন অনশন ধর্মঘট পালন করেন। ১৯৫২ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিকট মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। যুক্তফ্রন্টের এ-বিজয় ছিল পশ্চিমাদের ৭ বছরের শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিবাদ। যুক্তফ্রন্টের এ-বিজয়ও সরকার সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলো না। শুরু হলো ষড়যন্ত্রের। দেশে ৯২(ক) ধারা জারী করা হয়। ঈদের আগের দিন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ঐ বছরই কারামুক্ত হন। ১৯৫৮ সালে ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের ইতিহাসে জঘন্যতম অধ্যায়ের সূচনা । অভ্যুত্থানে আইয়ুব খান ক্ষমতার এলেন। সারাদেশ থেকে গণতন্ত্র বিদায় করে দিলেন এবং নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা হিসাবে দেশে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করলেন। করণ রাজনৈতিক নেতাদের কারাগারের বাইরে রেখে নিশ্চিন্তে দেশে সামরিক শাসন চালানো সম্ভব নয়। অতএব শেখ মুজিবকেও জেলে যেতে হয়।

১৯৬২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে জেল-জুলুম, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে হরতালের আহ্বান জানালেন শেখ মুজিব কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থাতেই। ৬ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে পাকিস্তান-জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে তাঁকে আটক করা হয়। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে সারা পূর্ব বাংলা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে ভরে উঠে, সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এই প্রদেশে দুই প্রধান ধর্মের লোকের মধ্যে দাঙ্গা বেঁধে যায়, শেখ মুজিব এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়, পরে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়।

১৯৬৪ সালের ৩১ শে মার্চ তাঁকে পুণরায় গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বক্তৃতা। অবশ্য এবারও জামিনে মুক্তি পান। নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারের সমালোচনার জন্য শেখ মুজিবকে ১৯৬৪ সালের ৭ নভেম্বর গ্রেফতার করে এবং পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরের ৩ তারিখে জন নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে আবার জামিনে মুক্তি দেয়।

১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে আবার গ্রেফতার হন। প্রতিটি জেলায় বক্তৃতা শেষে ঐ জেলা থেকে জারীকৃত ওয়ারেন্ট বলে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ একটি বক্তৃতার জন্য ১৯৬৭ সালের ২৮ এপ্রিল তাঁকে ১ মাসের বিনাশ্রম করাদণ্ড দেওয়া হয়, ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি এই দীর্ঘ সময় ধরে বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্ন সময় আটক রেখে বিচারের নামে প্রহসন চলতে থাকে। ১৯৬৭ সালে ১৭ জানুয়ারি গণনিরাপত্তা আন্দোলন থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু সাথে সাথে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামী হিসেবে আটক করে সামরিক তত্ত্বাবধানে নিয়ে যাওয়া হয়। আরো বাঙালি সামরিক-সিভিল কর্মকর্তা কর্মচারীদের অভিযুক্ত করা হলো এই মামলায়। সারা বাংলাদেশে শুরু হলো গণবিক্ষোভ, ১৯৬৯-এর সেই প্রবল গণআন্দোলনের মুখে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়।

মুক্তির পরদিনই রেসকোর্স ময়দানে লাখো লাখো জনতার উপস্থিতিতে ছাত্র জনতার পক্ষ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ডাকসুর তদানীন্তন সহ-সভাপতি ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধীতে ভূষিত করেন। সেই থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চের কালো রাত্রিতে হানাদার বাহিনী প্রথম আক্রমণেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। লায়লাপুর মিয়ানওয়ালী কারাগারে তাঁকে আটক রাখা হয় মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে। সামরিক ট্রাইবুনালে বিচারের ব্যবস্থাও করেছিলো পাকিস্তানী সরকার, আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বিজয় অর্জনের পর ১৯৭২ সালে ৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ৮ জানুয়ারি মুক্তমানব হিসাবে লন্ডনে পৌঁছান। এর একদিন পরেই বাংলার ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর স্বপ্নের স্বদেশে ফিরে ঘোষণা করেন, 'আমার স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে, বাঙালি আজ স্বাধীন।'

প্রকৌঃ মোঃ কবির আহমেদ ভূঁইয়া
এফ/০২৭০০

কেন তিনি জাতির পিতা

জাতির পিতা, 'ফাদার অব নেশান', একটি বহুল প্রচলিত শব্দগুচ্ছ। জাতি বলতে সেখানে অবশ্য স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রকেই বোঝায়, নৃতাত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতি ইঙ্গিত করে না। আমরা একথাও জানি যে, কোনো একক ব্যক্তি আন্তরিক অর্থে একটি জাতি রাষ্ট্রের জন্ম দেন না বা প্রতিষ্ঠা করেন না, কেউই তাঁর একক চেষ্টায় পরাধীনতা বা ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে বিশ্ব-মানচিত্রে কোনো নতুন একটি জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটান না। এর জন্য বহুকাল ধরে তীব্র কঠিন সংগ্রাম চলে, বহু নারী-পুরুষ সেই সংগ্রামে অংশ নেয়, নানা প্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে, আত্মাহুতি দেয়। তবু আমরা একথাও জানি যে, ইতিহাসের কোনো কোনো পর্বে, কোথাও কোথাও, একক ব্যক্তি এত বিশাল গগণচুম্বী সর্বপ্লাবী ভূমিকা পালন করেন, তাঁর অবদান এতে কেন্দ্রীয় ও চূড়ান্ত হয়ে ওঠে, ক্যাটালিটিক এজেন্ট হিসাবে তাঁর কর্মকাণ্ড এত ফলপ্রসূ হয় যে, দেশের মানুষ তখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর মাথায় জাতির পিতার শিরোপা পরিয়ে দেয় এবং বিশ্ববাসীও তাঁকে সেইভাবে দেখে। এইভাবেই আমরা পেয়েছি ভারতের মহাত্মা গান্ধীকে, পাকিস্তানের কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে, নয়া তুরস্কের আতাতুর্ককে এবং বাংলাদেশের শেখ মুজিবকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কেও সমগোত্রীয় শব্দগুচ্ছের প্রচলন আছে, তবে সেখানে বলা হয় প্রতিষ্ঠাতা-জনগণ-ফাউন্ডিং-ফাদার্স।

দীর্ঘকালব্যাপী যে পর্যায়ক্রমিক রাজনৈতিক আন্দোলন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল তার প্রধানতম প্রাণপুরুষ ছিলেন শেখ মুজিব। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির মাধ্যমে আমরা একটা মেকি স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, সে আন্দোলনের সঙ্গেও শেখ মুজিব জড়িত ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে অন্যান্য দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল, ব্রিটিশ ঔপনিবেশ বিরোধী মুসলমান তরুণের মতো তিনিও মুসলিম লীগের হয়ে নানা সংগ্রামী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। নবলব্ধ পাকিস্তানে যে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারটি অগ্রাধিকার পাবে না, পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সকল ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক প্রত্যাশা এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক অধিকার যে এখানে শুধু উপেক্ষিত নয়, নিষ্পেষিত ও লঙ্ঘিত হবে, সেটা বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি। এরই ফলে ১৯৪৮ সাল থেকেই আমরা তাঁকে স্বৈরাচারী অগণতান্ত্রিক শাসকবর্গের বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহন করতে দেখি। সভা-সমিতি এবং শোভাযাত্রা-হরতাল সংগঠনের অভিযোগে ১৯৪৮- এর মার্চ ও সেপ্টেম্বরে দু'বার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের ন্যায্য স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার 'অপরাধে' ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করা হয়। সে সময় আরো কতিপয় আন্দোলনকারী ভবিষ্যতে সৎ আচরণের মুচলিকা দিয়ে নিজেদের বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করিয়ে নেয়, কিন্তু শেখ মুজিবের কাছে তা ছিল অচিন্তনীয়। তখন থেকেই তাঁর সংগ্রামী চেতনা ও প্রত্যয় সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল। এরপর বহুবার তিনি অতি তুচ্ছ ও মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে জীবনের অনেকগুলি বছর কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অতিবাহিত করেন।

১৯৪৮ থেকে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকার এবং শেষে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত বাঙালির সংগ্রামী তৎপরতায় শেখ মুজিবের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে থাকে। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্র, বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করলেন। তাঁর এই বিকাশ অন্যান্য সব নেতা থেকে পৃথক করে তাঁকে এক অভূতপূর্ব মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করে। বিশেষ করে তাঁর অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করতে হয়। মধ্যষাটের দশকে তিনি যুগান্তকারী 'ছয়দফা' প্রণয়ন করেন এবং ছয়দফা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সংহত করেন। ছয়দফা'র মধ্যে নিহিত ছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বীজ।

১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৫ মার্চের মধ্যরাতে পাকিস্তান হয়ে উঠেছিল স্বাধীন বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন সেই বাংলাদেশের জনগণমন অধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তানের সঙ্গে এক অসাধারণ অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হয়, যা ব্যাপ্তিতে, শান্তিপূর্ণ প্রয়োগে, দৃঢ়তায় এবং সর্বাত্মক সাফল্যে বিশ্ব-ইতিহাসের সামনে এক অভূতপূর্ব নজির স্থাপন করেছে।

১৯৭১-এর ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসমাবেশের কথা, যেখানে বঙ্গবন্ধুর পরিচালনায় ৪১৭ জন নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলির সদস্য ছয়দফা এবং এগারোদফা কর্মসূচির প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ আনুগত্যের শপথ গ্রহন করেন। আমাদের বিশেষভাবে মনে পড়ে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে রেসকোর্সের ময়দানে দশ লক্ষাধিক মানুষের সামনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় ভাষনের কথা। তিনি দেশবাসীকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার কথা বলেন, যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রু প্রতিহত করার আহবান জানান, বলেন যে, লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে ।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অভ্যুদয় ঘটল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের, কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তখনো পাকিস্তান কারাগারে বন্দি; যদিও বিজয় বাঙালি স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছে যে, এবার তারা তাদের বীর নেতাকে শীঘ্রই নিজেদের মধ্যে ফিরে পাবে। ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য বাস্তবতার দাবিতে তাদের সে আশা পূর্ণ হতে বেশি দেরি হয়নি। বঙ্গবন্ধু বাংলার মাটিতে, তাঁর মুক্ত স্বদেশে ফিরে আসেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি।

অধ্যাপক ড. এম হাবিবুর রহমান
উপাচার্য, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
এফ/০৩২৭১

বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় শিক্ষাদর্শন ও গবেষণা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন , রাষ্ট্র ভাবনা ও সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ের মূলে যে দর্শন ছিল তা হলো বাংলার গণমানুষের মুক্তি। সোনার বাংলা নির্মাণে গণমানুষের মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুশিক্ষা ও গবেষণাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। বাঙালি জাতিকে বিশ্বে দরবারে এক অনন্য জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনায় ছিল মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব এবং প্রায়োগিক ও বাস্তবিক কৌশলের মেলবন্ধন। তিনি শিক্ষাখাতে সর্বো চ্চ পুঁজি বিনিয়োগ করে এদেশের মানুষকে গণতন্ত্র, দেশপ্রেম, জ্ঞান বিজ্ঞান, গবেষণা ও উদ্ভাবনসহ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে একটি বৈষম্যহীন, প্রগতিশীল, বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে সোনার বাংলা বিনির্মাণ করতে চেয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের ভিতর ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত দার্শনিক অর্ন্তদৃষ্টি। রাজনীতির হাতেখড়ি থেকেই তিনি শিক্ষা ভাবনায় বিশেষ মনোযেগী ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর যে দর্শন তৈরি হয়েছিল তা ভাষা আন্দোলনের সমসাময়িক বা তারও আগে। বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে চীনে গিয়েছিলেন এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে। বঙ্গবন্ধু চীনের শিক্ষাব্যবস্থা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি দিনবদলের হাওয়া লাগা চীনকে দেখে নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে হতভাগ্য দেশকে নিয়ে ভেবেছেন এবং করেছিলেন মহাপরিকল্পনা। সেই বিষয়ের প্রতিফলন 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি চীনের নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন, 'আমাদের দেশের মতো কেরানি পয়দা করার শিক্ষাব্যবস্থা আর নাই। কৃষি শিক্ষা, শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনিক্যাল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।' সে সময় চীন ভ্রমণ নিয়ে বঙ্গবন্ধু আরো বলেন, 'আমাকে একটি কৃষি স্কুল দেখানো হয়েছিল। সেখানে যুবক কৃষকদের কিছুদিনের জন্য শিক্ষা দিয়ে খামার জমিতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। শ্রমিকদের জন্য স্কুল করা হয়েছে। প্রত্যেক শিল্পকেন্দ্রের কাছে স্কুল আছে। বড়দের শিক্ষা দেওয়া হয় কাজে আর তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য আলাদা বন্দোবস্ত আছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আগে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে ও আওয়ামীলীগের ইশতিহারে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন। সে সময়কার আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতিহার নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- সমাজের মৌলিক প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী এ দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের সর্বাধিক উন্নতি সম্ভব করে তোলাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কতিপয় কর্মপন্থা নির্ণয় করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মোট দেশজ উৎপাদনের চার ভাগ শিক্ষা খাতে ব্যয়, নিরক্ষরতা দূরীকরণে 'জাতীয় সার্ভিস' প্রোগ্রাম, প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক, মাধ্যমিক শিক্ষা জনসাধারণের নাগালের মধ্যে আনা, উৎপাদনমখী শিক্ষার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে দক্ষজনশক্তি গড়ে তোলার জন্য বিশেষ নির্দেশনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু ও তৎকালীন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই রাষ্ট্রের সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তৎপর ছিল। এরই ধারাবাহিকতায়, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরিক দল আওয়ামী লীগ শিক্ষার সার্বজনীন দর্শনকে গুরুত্ব দিয়েছিল। তৎকালীন যুক্তফ্রন্টের মেনোফেস্টোতে ২১ দফার মধ্যে ৯, ১০ এবং ১১ নং দফায় যথাক্রমে দেশের সর্বত্র অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা; শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের ভেদাভেদ বিলোপ করে সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল আইন বাতিল এবং উচ্চশিক্ষা সহজলভ্য করা। এরই প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় শিক্ষার অধিকার, উদার শিক্ষানীতি প্রবর্তন, শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণসহ শিক্ষাব্যবস্থার আমলূ সংস্কারের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু জানতেন শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাই বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য তিনি যে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে শিক্ষার অধিকার ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবি তুলতেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ তাঁর নেপথ্যর নেতৃত্বেই দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তাঁর শিক্ষা দর্শনকে ধারণ করে এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলার ছাত্র সমাজ বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা নির্মাণ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু দেশের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অবকাঠামো বিনির্মাণ ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতির উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মোট ছয়টি শিক্ষা কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুবিভিন্ন সময় শিক্ষানীতির বৈষম্য দূরীকরণের জন্য আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্র-শিক্ষক-জনতার সঙ্গে থেকে অণুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং গণমখুী বিজ্ঞান-প্রযুক্তিমনস্ক, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষাদর্শন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুদেশে ফিরে প্রথমে মনোযোগী হয়েছিলেন যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশেরশিক্ষাব্যবস্থাকে পুর্নঠনের জন্য গণমানুষের মুক্তি, অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষণ-বৈষম্য থেকে মুক্তি এবং মানবিক মূল্যবোধ ও চেতনার বিকাশের জন্য শিক্ষাকে মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭২ সালে রচিত সংবিধানের কয়েকটি অংশ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু তাঁর শিক্ষা দর্শনের মূল ভাবনাটাই সংবিধানে প্রতিফলিত করেছেন। তিনি স্বাধীন দেশে 'সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা' বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বেতন মওকুফ করার নির্দেশনা দেন। এছাড়া তিনি ১৯৭২ সালে শিক্ষাব্যবস্থা পূর্নগঠনের জন্য বড় অংকের বাজেট ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু বিনামূল্যে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ এবং মাধ্যমিক পর্যন্ত শতকরা ৪০ শতাংশ কম দামে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর শিক্ষা দর্শনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তিনি প্রতিরক্ষা খাত থেকে শিক্ষাখাতে অনেক বেশি বরাদ্দ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেন, যাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠে। এছাড়া তিনি কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনসহ শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন অধ্যাদেশ ও অ্যাক্ট প্রণয়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ভিত্তি স্থাপন করে যান।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভাষণ, আওয়ামী লীগের ঘোষিত কর্মসূচী, ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহার, ১৯৭২ সালের সংবিধান, কুদরত-এ-খুদা কমিশনের প্রতিবেদন, ১৯৭২-৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন অধ্যাদেশ, অ্যাক্ট, আইন; তাঁর রচিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা, আমার দেখা নয়া চীনসহ বিভিন্ন গবেষণাধর্মী পত্র পত্রিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য একটি যুগোপযুগী, আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সম্বলিত শিক্ষা দর্শনের পথরেখা তৈরি করে গেছেন।

একইভাবে জাতির পিতা শুধু শিক্ষা নয়; শিক্ষাকে দেশের উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করতে গবেষণার তাৎপর্যও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণায় বৈশ্বিক জ্ঞান লাভের জন্য বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সময়কার কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবর্তনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে জাতিকে এগিয়ে নিতে পর্থ প্রদর্শন করে গেছেন। তিনি উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে উদার ও মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে এগিয়ে নিতে ১৯৭৩ সালে এক আদেশের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ত্বশাসন প্রদানকরেন।

বঙ্গবন্ধু এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক, বিজ্ঞান-মনস্ক করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি শিক্ষার সাবর্জ নীনতার মাধ্যমে মানুষের উদ্ভ বনী শক্তিকে ব্যবহার করে ভেতরের চিন্তাবোধ ও কল্পনাশক্তিকে বের করে আনার গভীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রাসঙ্গিক করে তোলার প্রয়াস করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাজের সুযোগ তৈরি করতে নানা ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শিক্ষা ও গবেষণা চুক্তি স্ব ক্ষর করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন গঠন করেন। এদেশের কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর ছিল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনা। তিনি কৃষিবিজ্ঞানের উন্নয়ন ও সমন্বয়সাধানের জন্য বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন। এদেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তায় তিনি ১৯৭৩ সালে আইন পাসের মাধ্যমে ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। বঙ্গবন্ধুর গবেষণা ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নতুন নতুন জাতের ধানের উদ্ভাবন হয়। এছাড়া সে সময় ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পাশাপাশি কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বোর্ড গড়ে ওঠে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতির পিতার আদর্শ ও শিক্ষা দর্শনকে উপজীব্য করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্ব্ব ধীন বতমান সরকার যুগোপোযুগী ও মানসম্মত শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে দেশের মানুষকে স্বনির্ভর করে তুলেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শনের আলোকে ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। মূলত বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শনের আলোকে এই শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে আগামী প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধ, জাতীয় ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নয়নকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন। দেশের প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা- সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি, চিকিৎসা, মেরিটাইম ডিজিটাল, টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে বর্তমান সরকার। বর্তমান সরকার শিক্ষার সবক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটিয়েছেন, যা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দর্শন অনুসরণের ফল। তাই এদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই অসাধারণ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার দর্শন তথা 'বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন'কে আরো এগিয়ে নেওয়ার জন্য সবাইকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান
ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি
এফ/০২২৫৫

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন ও ছাত্রলীগ গঠনে শেখ মুজিব আরও অনেকের সঙ্গে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে তাঁকে বহিস্কার করা হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা প্রদান করার দাবী জানান কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, খাজা নাজিমুদ্দিন প্রমুখ উক্ত প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করেন। ২১ মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় প্রদত্ত সংবর্ধনা সভায় ঘোষণা করেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে। ২১ মার্চ একই কথা তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন অনুষ্ঠানে বলার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে থেকে প্রথম সম্মিলিত প্রতিবাদ হয় এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়।

শেখ মুজিব ১৯৫১ সালে পাকিস্তান গঠনতন্ত্রের খসড়া মূলনীতির বিরোধিতা করেন। ইতোমধ্যে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বের ইতিহাসে সর্ব প্রথম মাতৃভাষার জন্য বাংলার মানুষ প্রাণ বিসর্জন দেয়। এর প্রতিবাদে শেখ মুজিব কারাগারে অনশন শুরু করেন। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে নির্বাচনী ইসতেহার হিসেবে ২১ দফা প্রণীত হয়। যার প্রথম দফাই ছিল যে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হতে হবে। ২১ দফা ছাত্র সমাজ ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। অতঃপর ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তফ্রন্ট কার্যত ভেঙ্গে গেলে ফেডারেল কোর্টের নির্দেশ অনুসারে ৩১ তারিখে ২য় গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্যদের সাথে শেখ মুজিবও সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালের ২২ অক্টোবর তারিখে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে 'আওয়ামী মুসলীম লীগ' এর নাম হতে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য আওয়ামী লীগের দ্বার অবারিত করা হয়। জন্ম হয় একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনের। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জাকে অপসারণ করে আইয়ুব খান নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। অতঃপর নিজেই ফিল্ড মার্শাল পদ গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষা কমিশন কর্তৃক দাখিলকৃত শিক্ষানীতি বাতিলের দাবীতে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ আন্দোলন শুরু করে। শেখ মুজিব ১৯৬৩ সালে কারামুক্ত হয়ে আইয়ুব খানের ১৯৬২ সালের সংবিধানের বিরোধিতা করাসহ প্রতিটি গণআন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে থাকে। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা আরম্ভ হলে শেখ মুজিবের উদ্যোগে গঠিত 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি'। "পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও" শিরোনামে একটি মর্মস্পর্শী ইস্তেহার প্রচার করে। এই ইস্তেহার প্রচারের জন্যও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন। আইয়ুব খান ঘোষণা করেন যে, অস্ত্রের ভাষায় ৬-দফা কর্মসূচির জবাব দেয়া হবে। ২৩ জুন রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার বর্জনের সরকারি সিদ্ধান্ত প্রচারিত হলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। ১৯৬৭ সালে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রায় দেড় ডজন ফৌজদারী মামলা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় দায়ের করা হয় এবং তিনি ক্রমাগত গ্রেফতার হতে থাকেন। ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮ তারিখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান আসামী হিসেবে শেখ মুজিবুরকে গ্রেফতার দেখানো হয়। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা আইনে তিনি পূর্ব হইতেই জেলে ছিলেন। পরবর্তীতে ঐ মামলায় তাঁকে ১নং আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয় এবং ১৯৬৮ সালের জুন মাসে মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে শুনানী শেষ হয়। ২৯ ফেব্রুয়ারি সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করলে শেখ মুজিবসহ সকল আসামী মুক্তিলাভ করেন।

আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের পর ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় শেখ মুজিব জন সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন। ঐদিন ছাত্রজনতার পক্ষ হতে তাঁকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ২৪ মার্চ ১৯৬৯ সালে দেশব্যাপি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুক খান তার নিজের প্রণীত ১৯৬২ সালের সংবিধান ভঙ্গ করে জাতীয় পরিষদের স্পিকারের পরিবর্তে জেনারেল ইয়াহিয়া খান তথা সামরিক বাহিনীর নিকট পাকিস্তানের শাসনভার হস্তান্তর করেন। ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ তারিখে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্য দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান এর নাম 'বাংলাদেশ' নামকরণ করেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রদত্ত ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ তারিখের এক আদেশ বলে পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বিলুপ্ত করে চারটি প্রদেশ গঠন করা হয় এবং ইসলামাবাদ ও কেন্দ্রীয় শাসিত এলাকা ফেডারেল এলাকা ঘোষিত হয়। একই তারিখের Legal Framework Order (LFO) বলে প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে ১৩ জন মহিলা আসনের জাতীয় পরিষদ গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়।

ইতোমধ্যে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে LFO এর আওতায় অখণ্ড পাকিস্তানে প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচন করে এবং পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করেন। ৩০ ডিসেম্বর সরকার পক্ষ হতে ঘোষণা করা হয় যে জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে এইরূপ বিপুল জয়লাভের পর শেখ মুজিব তাঁর সকল সংসদ সদস্যদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য শপথ বাক্য পাঠ করেন। ১১ জানুয়ারি ইয়াহিয়া ঢাকায় আগমন করে এবং শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা করেন। ১৭ জানুয়ারি তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান।

আওয়ামী লীগ ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার সুপারিশ করেন কিন্তু ভুট্টো ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগে অধিবেশন ডাকার পক্ষপাতি ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের এক ঘোষণা বলে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তা-নর শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ঢাকায় ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচন করে। ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বানে বাঙ্গালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে। দীর্ঘ নয় মাসের আন্দোলন, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও ত্রিশলাখ প্রাণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য, বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ।

প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ
ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি
এফ/০৪০০০

বঙ্গবন্ধু স্মরণীয় উক্তি

“সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীণ। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুখ-শান্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাংখাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি।”

“এই স্বাধীনতা তখনই আমর কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলার কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।”

“প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কোন ইচ্ছা আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারা জীবন মনে রাখব।”

“দেশ থেকে সর্বপ্রথম অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি জীবন উৎসর্গ করব।”

“সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙ্গাল আমি। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না।”

“আর সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না।”

“জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সাথে আর কিছুই নিয়ে যাব না। তবে কেন আপনারা মানুষকে শোষণ করবেন, মানুষের উপর অত্যাচার করবেন।”

“মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে।”

“এই স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরী না পায় বা কাজ না পায়।”

“গরীবের উপর অত্যাচার করলে আল্লাহর কাছে তার জবাব দিতে হবে।”

Engr. Md. Shafiqul Islam
Project Director
Padma Multipurpose Bridge Project
F/04890

The Padma Bridge A Unique Symbol of Strong Determination and Courage of Prime Minister Sheikh Hasina

The Padma Bridge is located about 40 km southwest of Dhaka, with a total length of 9.8 km, and of that, the main bridge is 6.15 km long.

It is Bangladesh's longest bridge to date, self-financed project and is a symbol of pride and capacity of the Bengali nation. It is the largest and most challenging infrastructure project in Bangladesh's history.

The bridge built at a cost of nearly BDT 32,600crore or $3.6bn, connects the impoverished southwestern region to the capital. Padma Bridge itself is an engineering marvel with a majestic architectural design. Construction of the bridge is a great feat as the Padma is the most treacherous and unpredictable river after the Amazon River of South America. It is contributing to the socio-economic development and the improvement of local living standards at the southwest districts.

China's state-owned Railway Major Bridge Engineering Company was tasked to lead the construction of the bridge with the help of about 1200 Bangladeshi engineers and 4000 workers. The construction of the bridge started in December 2014. The construction of the main bridge was commissioned for revenue in June 2022. It is noteworthy that the project was not been significantly delayed in the construction schedule despite the COVID-19 pandemic.

Uncertainty in Financing

There are some surprising facts about funding of the project. The construction of the Padma Bridge had been going through uncertainty from the very beginning. When the design work was nearing completion and consultants were busy shortlisting contractors, it was at this time that the conspiracy started with the financing of the bridge. Donors stepped back on funding commitments, accusing some officials of mass bribery.The whole nation was shocked by this and the government officials fell into a deep shame. The future of the Padma Bridge as if covered by a dark cloud.

Uncovering a Deep Conspiracy

At that time, public debate over the financing of the project was at the peak involving some fascinating stories. The World Bank said in 2012 that it found elements of corruption in the tender for the Padma Bridge and decided to stay away from funding $1.2 billion for the project. Following the World Bank, other donor agencies also retreated. The early allegations of bribery and corruption switched into an international investigation involving the Canadian engineering firm SNC-Lavalin, one of the five companies shortlisted for a $50 million construction supervision contract. The case collapsed in Toronto in 2017 after a judge threw out all wiretap evidence. The Anti-Corruption Commission in Bangladesh investigated the allegations against a government minister and other officials and found no proof of corruption.

Bold step of the Prime Minister

Prime Minister Sheikh Hasina took very strong and courageous action during that bad situation. She declared that her government would build the bridge with its own funds. No foreign funds from any bilateral or multilateral funding agency have financially contributed to its construction. By constructing the bridge in a span of just eight years it was proved wrong about the common perception that Bangladesh cannot do anything without financial assistance by lenders.

INAUGURATION COMPLEX OF PADMA BRIDGE

Excellent Virtues of Prime Minister Sheikh Hasina

Sheikh Hasina is the elated daughter of the father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Her intellect, wisdom and experience, philosophical thinking has made her far-reaching thinker. Her charismatic optimism, strength has delivered the nation to a high dignity in international arena. She also became something of a feminist icon in the world. On January 6, 2009, 22 days after the Prime Minister Sheikh Hasina-led government assumed power, a US-based multinational company named AECOM was appointed as a design consultant for Padma Bridge, thus proves her foresight towards building mega projects in the country.

DAY VIEW OF PADMA BRIDGE

Benefits Gained through the Padma Bridge

The Padma Bridge has become an important transportation junction to establish direct communication between the capital Dhaka and 21 districts in the southern part of the country by road and rail. Khulna and Barisal divisions and of greater Faridpur - with about 19% of the total population, enjoy the bridge most for the swiftest road link to the capital. The entire country has come under an integrated communication system through the launch of Padma multi-purpose bridge. Payra and Mongla Ports or Benapole Land Ports are no longer isola ted areas. Direct road communication between the capital and the three ports has been established thus contributing to the national economy. Sundarbans, Cox's Bazar and Kuakata beach are tied in the same thread. It is now possible to travel from Dhaka to Kuakata by road without ferry. The tourist attraction at Kuakata will increase due to the construction of the Padma Bridge.

Due to the Padma Bridge, Mongla port, Payra and Benapole port-centric activities have been speeded up. Goods can arrive in Dhaka in just three hours from Mongla port. Earlier it used to take 8 to 9 hours. It used to take 14 hours from Mongla directly to Chattogram Port. Due to the bridge, it has been reduced by 7 to 8 hours.

In just one year, the positive impact of the Padma Bridge on the country's economy and people's lifestyle has become evident. According to the Feasibility Study report, the country's GDP will increase by 1.2 percent when the bridge is opened. The poverty rate will reduce by 0.84 percentage point per year.

This will increase the income of people in that region by 1.4 percent and create 7,43,000 new jobs. A total of 41,600 vehicles are projected to use the bridge daily in the year 2025 and the EIRR (Economic Internal Rate of Return) was calculated to 14.80% in the Feasibility Study. No doubt the figure of vehicles will go up considering Bangladesh's high rate of projected economic growth.According to one study, a benefit-cost ratio (BCR) of 4.4 and an economic internal rate of return well in excess of the economic opportunity cost was calculated.

Strengthening of Regional Connectivity due to Padma Bridge

The bridge will dramatically enhance regional connectivity and the economic opportunities in Bangladesh and open up the further possibility of regional development. A future new link-up with the Dhaka and Kolkata metropolises through road and rail is another prospect and adds to the utility of the bridge. By all counts, the bridge will have the greatest of impacts on regional co-operation with its road and rail connection. Onward connections to other parts of the SAARC group will tend to become easier. The bridge will eventually connect to the International Asian Highway AH-1 and Trans-Asian Railway Network.The role of Payraport in the field of international communication is undeniable. If the deep-sea port at Payra of Patuakhali is completed with all modern facilities and in time, Padma Bridge will have to stand up and need no other economic validation.

Impact on People's lives and Economy

The goal with which the Padma Bridge was inaugurated a year ago, it can be said that much of it has been fulfilled. Mainly connecting the communication and transportation, this large bridge connects the economy of the 21 districts of the south with the main economic center of Bangladesh i.e. the capital Dhaka and its surrounding industrial area. From those districts, agricultural, SME products including fish are now easily entering the main markets of the whole country including Dhaka in a short period of time. As a result, the economy of these districts has been strengthened. Both domestic consumption and demand are increasing in these district.

RIVER TRAINING WORKS AT JANJIRA

Tourist traffic has also increased in Bagerhat, Sundarbans, Kuakata. All these have affected the local market.

There has been no official or private survey on the impact on people's lives and economy after the bridge was opened. However, the easy communication system developed throug it, the impact of this bridge on the agricultural, industrial and service sectors of the sout western region is very clear in the first year. The vibrancy in trade and tourism has been noticeable in the first year itself. Shortening the time gap in communication has benefits in education and medicine. All in all, there is no doubt that the socio-economic life of the people of 21 districts has changed compared to before. Not only a specific region, but the connection of Padma Bridge has changed the overall calculations and future plans of the country's economy, which will become more evident in the days to come.

Most Complex Bridge Project in the World

Padma is one of the major rivers in the world with an alluvial bed and complex morphology. It has a discharge of approximately 150,000 m3/s during a 100-year flood event and about 1billion tons of sediment is transported annually.

Padma is a meandering having severe river currents and extreme erosion patterns. Ithas a flow velocity of 4.5 meters per second. The maximum scour depth is about 62meter. The Sedimentation and the Flow Slide tendency is also very high.In such a situation construction of bridge is very difficult.

The Padma Bridge features many engineering highlights, notably:

- The longest bridge over the Padma River by both span and total length
- A monsoon-defying, seismic-resilient and scour-tolerant bridge design
- Prefabricated 150-meter span steel truss modules which act compositely with prestressed concrete deck slabs
- World Record: the longest and deepest piling among all bridges in the world (up to 127 meters deep) and biggest Friction Pendulum Bearings
- A two-level road and heavy (freight) railway river crossing, consisting of a dual two lane carriageway on the top deck and a single-track freight railway on the lower dec
- Support of a 750mm-diameter gas main and fiber optic communication cables.

Due to the situation requiring great effort during its construction the bridge is regarded as one of the **most complex bridges in the world.**

Padma Bridge has captured 4 Superscale World Records–

- Longest raking pile of 3m dia, 125m long, buried depth 122m;
- Longest Steel Truss Girder Bridge of 41 spans, each of 150m and weighs 3200 Ton;
- Largest Double Curvature Friction Pendulum Bearing (Capacity 98,725 kN);
- Largest single contract for River Training Work (USD 1.1bn)

Padma Bridge has fulfilled the hopes and aspirations of the nation in all respects. That is why Padma Bridge is called the ‘Bridge of Pride’.

Conclusion

The railway line completion work shall give the real worth of the bridge. Once it is operational, connecting the hearts of the two parts of historical Bengal, it will not only be a great boon but also for the areas beyond — to the west and the south-west and to the east and the north-east. New economic zones and high-tech parks will be built centering on the bridge. As a result, domestic and foreign investment will be attracted and the pace of industrialization of the country will be accelerated. All in all, it can be safely said that the Padma Bridge has not only given a new energy to the economy of Bangladesh, but this connectivity has also opened the door of possibilities in the country's business and commerce.

The Padma Bridge would be remembered for the challenges faced in its completion and the great role it would be making in the years to come in regional co-operation and integration. Padma Bridge is now the largest ever edifice thus opening doors and making dreams possible for future bridges at Chandpur-Shariatpur, Bahaduarabad-Fulchorighat and Daulatdia-Paturiaat venture. The Padma Bridge is a major plank in all such dreams

Engr Sheikh Masum Kamal
Vice-Chairman (Academic & HRD)
IEB, Dhaka Centre
F/07659

Bangabandhu - A charismatic leader beyond borders

Some historical figures stand out like legends, blazing the way to liberation, advancement, and prosperity. One such beacon was Bangladesh's respected founding father, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. His unshakeable spirit gave light to the torch of freedom that resulted in the creation of our dear nation. He was a man of unwavering determination and great vision.

What served as the cornerstone of Bangabandhu's leadership was an unshakable commitment to the values of democracy, equality and social justice. He forged a unified front against injustice by bringing people from all walks of life together with his unmatched charm and eloquence. It goes without saying that his vision for an independent Bangladesh, where each person might flourish, struck a strong chord with the populace.

The people of Bangladesh were not the only people to be in touch with his charisma, as his praise is talked of far and wide. The World Peace Council awarded Bangabandhu the Joliot Curie award for his contributions towards world peace. The Joliot Curie award is given to those who have played historical roles in fighting fascism & promoting humanity to establish global peace.

Foreign leaders, notably those that came into contact with the great Bangabandhu, have all praised him for his wondrous presence. As a matter of fact, when the foreign minister of Sri Lanka, Lakshman Kadirgamar came to Bangladesh, he has been documented to have said - “In the last few centuries, South Asia has given the world many teachers, philosophers, skilled statesmen, political leaders and warriors. But Sheikh Mujibur Rahman surpasses everything; his place is fixed in the highest position.” It goes without saying that this is not a minor praise, especially from someone so diplomatically learned.

There were even times when our legendary leader was compared to the highest peak of the world. The Cuban revolutionary leader Fidel Castro, upon meeting Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at the Non-Aligned Summit in Algiers in 1973, has said “I have not seen the Himalayas, but I have seen Sheikh Mujib”. To be compared with the great & timeless Himalayas, speaks a lot about the greatness of Bangabandhu himself.

In 1972, during the MUJIB-BREZHNEV TALKS in Russia, the Soviet General Secretary Leonid Brezhnev praised Bangabandhu for his outstanding leadership in Bangladesh. The people of the then Soviet Union, also made a documentary film about Bangabandhu’s visit, titled “Friendship and Cordiality (1972)”. I do not think many leaders of today’s world are treated with so much care & respect. It is clear

as day, how different Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was from the leaders of today.

It is true that in diplomacy, there are no indefinite enemies or friends. Despite the US not recognizing Bangladesh's independence, because of Bangabandhu's talented skills in diplomacy, they ultimately did recognize Bangladesh as a free and independent state in 1972. Then president Richard Nixon and his close aide Henry Kissinger had a special dislike for Bangladesh's cause, but due to the father of our nation's interventions - Bangladesh & the US has been building bridges.

Bangabandhu was tragically taken away from us. This is a loss we will never be able to recover from. During his stay with us, he did more for Bangladesh than any leader has for their own country. This legendary leader has laid the foundation for us Bangladeshis to grow upon. His deeds & diplomatic talents gave Bangladesh the much needed nutrition, during Bangladesh's days of infancy.
It is not a matter of wonder, why everyone who came into contact with our great leader, had nothing but extremely unique things to say about him. His unmatched personality & the unyielding fire of his spirit, earns him a place within our hearts forever.

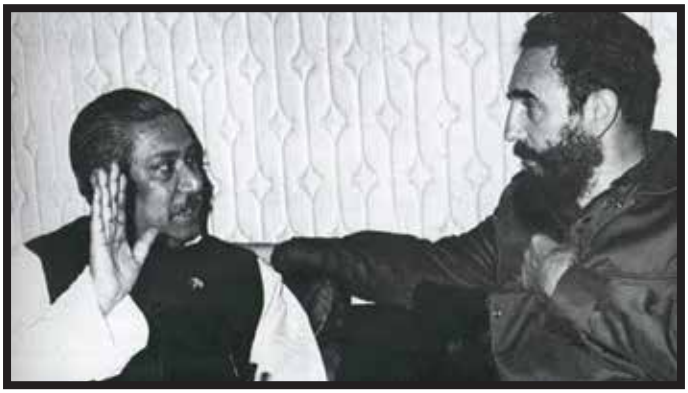

প্রকৌশলী শেখ আব্দুল মান্নান
এফ/০৮১৮২
যুগ্ম সচিব(অবঃ)

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একই আদ্যক্ষরের সমার্থক ঃ রক্তাক্ত ১৫আগষ্ট স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পুনরুত্থান

হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীন বাংলাদেশ। আর এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে যিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তিনি হলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরুটা হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের শুরু থেকে। অচিরেই বাঙালিদের নিকট পাকিস্তানিদের আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কার হলো। শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রে বসে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের উপনিবেশ বানানের আকাঙ্খা পরিষ্কার হলো যখন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার পরিকল্পনা করল। বাঙালিদের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে যখন পূব পাকিস্তানের বড়বড় উপাধিধারী জেষ্ঠ্য নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার মঞ্চে নিজেদের অধিষ্ঠিত করতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অনুকম্পা পেতে ব্যস্তছিল; তখন একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই এসকল স্বার্থন্বেষী সুযোগ সন্ধানী নেতৃত্বের বিরোধীতারমুখে বাঙালি জাতিকে সংগঠিত করার কঠিন দায়িত্ব গ্রহন করেন। লক্ষ্যে অবিচল থেকে জেল-জুলুম উপেক্ষা করে বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে ও বাংলাদেশ স্বাধীন করতে তিনি ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছেন।

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুঃ

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন, তখন থেকেই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত। ১৯৫২ সালে কারাগারে বন্দী থাকলেও মূলত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই ছাত্রজনতা ভাষা আন্দোলনে শামিল হয়।

ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। ১০ মার্চ রাতে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি সভা বসল। সভায় আপোসকামীদের ষড়যন্ত্র স্পষ্ট হলো। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়কসহ অনেকেই তখন দোদুল্যমানতায় ভুগছে, আপস করতে চাইছে সরকারের সঙ্গে। একটি বজ্রকণ্ঠ সচকিত হয়ে উঠল, 'সরকার কি আপসের প্রস্তাব দিয়েছে? নাজিমুদ্দিন সরকার কি বাংলা ভাষার দাবি মেনে নিয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে তবে আগামীকাল ধর্মঘট হবে, সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিং হবে। ছাত্রনেতা শেখ মুজিবকে সমর্থন দিলেন অলি আহাদ, তোহা, মোগলটুলীর শওকত সাহেব, শামসুল হক সাহেব। আপসকামীদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেল। এ সম্পর্কে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে অলি আহাদ বলেছিলেন 'সেদিন সন্ধ্যায় যদি মুজিব ভাই ঢাকায় না পৌঁছাতেন তাহলে ১১ মার্চের হরতাল, পিকেটিং কিছুই হতো না'। ১১ মার্চ হরতাল হয়েছিল, পিকেটিং হয়েছিল সেক্রেটারিয়েটের সামনে, সেখান থেকে ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

১১ মার্চের আন্দোলন তখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা পূর্ব পাকিস্তানে। বেগতিক দেখে খাজা নাজিমুদ্দিন আপসের কথা তুললেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর ৮ দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় যেহেতু বঙ্গবন্ধুসহ ভাষা আন্দোলনের অধিকাংশ নেতা কারারুদ্ধ ছিলেন, সেহেতু চুক্তির খসড়া কারাগারে নিয়ে তাতে তাদের সকলের সম্মতি নেওয়া হয়। শর্তানুসারে ১৫ মার্চ নেতারা মুক্তি পেলেন। বঙ্গবন্ধু জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন পুলিশি জুলুম ও সরকারের গণবিরোধী ভূমিকায় ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা তাদের দাবি আদায়ে বদ্ধপরিকর। মুজিব জনতার মনের কথাটি ধরতে পারলেন। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ছাত্র-জনতার সভা অনুষ্ঠিত হলো। তিনি আন্দোলনের কিছু দিক নির্দেশনা দেন। সভা শেষে সরকারকে দাবি আদায়ে বাধ্য করতে তিনি ছাত্র-জনতাকে সাথে নিয়ে আইনসভা ঘেরাও করেছিলেন। সেখানে পুলিশের লাঠিচার্জ হয়েছিল, কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়েছিল। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেদিন সংগ্রামী ছাত্রসমাজ সমস্ত ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশি কার্যক্রমের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দেন। ১৯ মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের অধিকার

আদায়ের লক্ষ্যে একটি আন্দোলন সংগঠিত করতে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। এ ঘটনায় ১১ সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন।

১৯৫২ সালে কারাগারে বন্দী থাকলেও মূলত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই ছাত্রজনতা ভাষা আন্দোলনে শামিল হয়। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট হয়েছিল। মিছিল করে সারা শহর প্রদক্ষিণ করেছিল শত সহস্র ছাত্র জনতা। মিছিল শেষে বেলায় জমা হয়েছে সবাই পরবর্তী ঘোষণার জন্য। শামসুল হক চৌধুরী, গোলাম মওলা, আব্দুস সামাদ আজাদের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একুশের দেশব্যাপী হরতালের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। মিছিল করে সেদিন আইনসভা ঘেরাও করতে এবং বাংলা ভাষার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আইনসভার সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে তিনি পরামর্শ দেন।তিনি আরও একটি খবর পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি এবং মহিউদ্দিন সাহেব রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে অনশন করবেন।

অনশনের নোটিশ দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হলো ১৬ ফেব্রুয়ারি। যাবার কালে নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে তার সঙ্গে দেখা করলেন জনাব শামসুদ্দোহাসহ অনেকে। বঙ্গবন্ধু তাদেরকে জানালেন তাঁর এবং মহিউদ্দিন সাহেবের অনশনের কথা। আরো একবার অনুরোধ করে গেলেন যেন একুশে ফেব্রুয়ারিতে হরতাল-মিছিল শেষে আইনসভা ঘেরাও করে বাংলা ভাষার সমর্থনে সদস্যদের স্বাক্ষর আদায় করা হয়।

১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিবসহ সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে সভা হলো। সেই সভায় জানানো হলো একুশের হরতালের প্রতি দৃঢ় সমর্থন। সালাম, রফিক,জব্বার,বরকত ও শফিকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হলো। একুশের রক্তাক্ত সংগ্রাম মুসলিম লীগ সরকারকে কোণঠাসা করে ফেলে। সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্ত বঙ্গবন্ধু তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে সমুন্নত ও বিকশিত করার জন্য।

৬-দফা আন্দোলন ঃ

১৯৬৬ সালের ৭ জুন বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জ্ঞাপন করেন তৎকালীন পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬ দফার পক্ষে জোরদার কর্মসূচী গৃহীত হয়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এই ৬ দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করে নিরাপত্তা আইনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও ছাত্র-জনতার উপর শাসক গোষ্ঠির ভয়াবহ জুলুম নির্যাতন নেমে আসে। ঢাকা কারাগারসহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি রাখা হয় শত শত আওয়ামীলীগ নেতা কর্মী সমর্থককে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ঃ

১৯৬৮ সালে জানুয়ারী মাসে বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করা হয়। ১৭ জানুয়ারী কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে জেলগেট থেকে পুনরায় গ্রেফতার করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক হেফাজতে নেয়া হয়। প্রথমে সামরিক আইনে বিচার করার সিদ্ধান্ত নিলেও জনরোষের ভয়ে প্রচলিত আইনে অভিযুক্ত করে। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে ফুঁসে উঠে সমগ্র দেশ। "জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো"- শ্লোগানে শ্লোগানে রাজপথ প্রকম্পিত হতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারী ছাত্র নেতৃবৃন্দ ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার ঘোষণা দেয় । ১৮ জানুয়ারি কর্মসূচিতে হামলা চালানো হয়। ২০ জানুয়ারি মিছিলে ইপিআরএর গুলিবর্ষণে ছাত্রনেতা আসাদের মৃত্যু হয়। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে কর্মসূচি দেয় ছাত্র সংগঠনগুলো। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা ও শ্রমিক-কর্মচারীরা এসে যোগ দেয় তাতে। ২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি পরপর তিন দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা হয়। ২৪ জানুয়ারী হরতাল চলাকালে ঢাকার নবকুমার ইনষ্টিটিউটের নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। রাতে কারফিউ ভেঙ্গে ছাত্র-জনতা রাজপথে মিছিল বের করলে সেনাবাহিনী ও ইপিআর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে অসংখ্য মানুষকে হতাহত করে। টঙ্গী ও আদমজীতে নিহত হন অসংখ্য শ্রমিক ও দিনমজুর। ২৪ জানুয়ারিতে এটি গণঅভ্যুত্থানে রূপলাভ করে।

এদিকে এমনি উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে বন্দি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করা হলে তাতে নিহত হন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক। এ হত্যাকান্ডের খবর প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনতা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন ও অন্যান্য ভবনে অগ্নিসংযোগ করে। ছাত্র-জনতা ঢাকা শহরকে অচল করে ফেলে, কারফিউ ভঙ্গ করে রাজপথ অবরোধ করে। ঢাকাসহ সারা দেশের রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে পড়ে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। এই ঘটনায় সারাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মতো। কারফিউ উপেক্ষা করে ছাত্র জনতা রাজপথে নেমে আসে। স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের পতন ঘন্টা বেজে যায়। গণ আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত আইয়ুব সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবসহ সকল বন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়। পরবর্তীতে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। চলমান পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানের বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লে আইয়ুব খান ২৫ মার্চ পাকিস্তানের শাসনভার সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়।

১৯৭০ এর নির্বাচন ঃ

১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান জাতীয় নির্বাচন ঘোষণা করার পর "ভোটের বাক্সে লাথি মারো" শ্লোগান তুলে মাওলানা ভাসানী নির্বাচন বর্জন করলেও বঙ্গবন্ধু দ্বিমত পোষণ করে বলেন, "আমি বিচ্ছন্নতাবাদী নই, জনগণের ম্যান্ডেট নিয়েই আমি বাঙালির স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা করবো, প্রয়োজনে বাংলার স্বাধীনতার জন্য রক্ত দেবো।" ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার মধ্য দিয়ে বিশ্বসভায় প্রমাণিত হয়ে যায়, পূর্ব বাংলা শুধু নয় সমস্ত পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তারপর শুরু হয় ষড়যন্ত্রের নতুন অধ্যায়। পাকিস্তানি শাসকেরা নিয়মতান্ত্রিক পথে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নতুন নতুন অপকৌশল নিতে থাকে।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ১৯৭১ ঃ

১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১, ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন যে, ৩ মার্চ সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসবে ঢাকায়। কিন্তু ১ মার্চ দুপুর ১২:০০ টায় তিনি সেটা স্থগিত করেন। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান। ২ মার্চের হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিন্দা জানান। পাকিস্তানি শাসকেরা বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা শুরু করায় বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগের ডাক দেন। তিনি ঘোষণা করেন, "হরতাল চলবে, কেউ অফিস আদালতে যাবেন না, কিন্তু মাস শেষে বেতন নিবেন, কেউ কোন ট্যাক্স দিবেন না। ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন আধাবেলা হরতাল এবং ৭ মার্চ বেলা ২:০০ টায় রেসকোর্স ময়দানে জনসভা"। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে কার্যত সব কিছু পরিচালিত হতে থাকে একটি প্যারালাল গভমেন্টের অধীনে।

৭ মার্চের জনসভার প্রচার প্রচারণা থেকে শুরু করে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতৃবৃন্দ তৎপর ছিল। সে সময় এনএসএফ এর গুন্ডারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গোপনে তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতো। এই স্বার্থান্বেষী মহলটি যেন কোনভাবে জনসভা অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে ছাত্রদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ছাত্রজনতার মুহুর্মুহু শ্লোগানে সভাস্থল ছাড়িয়ে সমগ্র ঢাকা শহর প্রকম্পিত হতে থাকে। সভাস্থলে পৌঁছাতে বঙ্গবন্ধুর কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল। চারিদিকে গুজব রটলো সভাস্থলে আসার পথে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হবে। সব কিছু তুচ্ছ করে বীরদর্পে সভামঞ্চে আরোহণ করলেন বঙ্গবন্ধু। লাখো জনতার শ্লোগানে শ্লোগানে প্রকম্পিত হতে লাগলো তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান **"তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা", "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর," 'জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু।"**

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ১৯৭১ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখো জনতার উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল', 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে', 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্'। অত:পর তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণটিই ছিল মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ও রূপরেখা। এই ভাষণের প্রতিটি অক্ষরকে দিকনির্দেশনা হিসেবে ধরে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ভাষণকে ইউনেস্কো কর্তৃক 'ওয়ার্ল্ডস ডকুমেন্টারি হেরিটেজ' হিসাবে স্বীকৃতি আমাদের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুকে করেছে আরও মহান ও বিশ্বময়।

২৬ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা ঃ

২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী রাজপথে নেমে আসে এবং ঘুমন্ত রাজধানীবাসীর উপর পরিকল্পিত গণহত্যা শুরু করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এ নৃশংসতা ছিল সর্বকালের সবচেয়ে নির্মম ও ভয়াবহ। চারিদিকে শুধু ধ্বংসস্তুপ আর মানুষের লাশ। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন যা তৎকালীন ইপিআর এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হয়। পাক হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডি ৩২নং এর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে।

মুক্তিযুদ্ধ ঃ

নির্বাচনকালীন সময় থেকে বঙ্গবন্ধু ৩২ নং থেকে নেতাকর্মীদের পরবর্তী করণীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিতেন। ৭ মার্চের পর তিনি ছাত্রদের হল ছেড়ে প্রত্যেকের নিজস্ব এলাকায় গিয়ে স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন। আওয়ামী লীগের জেষ্ঠ্য নেতৃবৃন্দকে বঙ্গবন্ধুমুক্তিযুদ্ধের যে সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি তিনি সম্পন্ন করে রেখেছিলেন তা অবহিত করেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকার সহজেই এবং দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সহযোগীতা লাভ করে। ভারত সরকার শুধুমাত্র এককোটি শরনার্থীর আশ্রয় দেয়নি, মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষন , অস্ত্র- গোলাবারুদও সরবরাহ করেছি-ল। পাকিস্তানে কারারুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রতিটি বাঙালির জন্য অনুপ্রেরণাও সাহস। মাত্র নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ১৬ই ডিসেম্বর

পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ চুড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

দেশ গড়ায় বঙ্গবন্ধুঃ

পাকিস্তানি শাসনামলে দীর্ঘ বঞ্চনার শিকার এ ভূখন্ডে উল্লেখ করার মত কোনোরূপ অবকাঠামোগত উন্নয়ন না হলেও সেই বৃটিশ শাসনামল থেকে হাতে গোনা যেসকল অবকাঠামো নির্মিত হয়েছিল, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালে নিজেদের পরাজয় আঁচ করতে পেরে সে সকল অবকাঠামো একে একে ধ্বংস করে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত সরকার এ সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো পুন:নির্মাণ অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছিল। খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুন:প্রতিষ্ঠা করেছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, ভৈরব রেল সেতুসহ প্রায় ৩০০ টি রেল সেতু সংস্কার, ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথ মেরামত ও সংস্কারের মাধ্যমে রেল যোগাযোগ পুন:প্রতিষ্ঠা করা হয়। অনুরূপভাবে সারাদেশের প্রায় ২৭৪ টি ছোটবড় সড়ক সেতু পুন:নির্মাণ, ক্ষতিগ্রস্ত সড়কগুলো পুন:নির্মাণের মাধ্যমে সড়ক পথে যোগাযোগ পুন:প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকহানাদার বাহিনী চট্টগ্রাম বন্দর অচল করতে বিস্তীর্নএলাকায় পানিতে মাইন স্থাপন করে। রাশিয়ার প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় এ সকল মাইন অপসারণ ও ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুন:নির্মাণ করে নদী বন্দরগুলো সচল করা হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত বিদ্যুৎকেন্দ্র, বিদ্যুৎ সাব স্টেশন ও সঞ্চালন লাইন মেরামত, পুন:নির্মাণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন পুন:প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত সরকারি অফিস আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনসমূহ অত্যন্ত দ্রুততম সময়ে পুন:নির্মাণ ও মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়।

স্বল্পতম সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশে অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ/মেরামত করা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ মেধা, প্রজ্ঞা, ঐকান্তিক ইচ্ছে ও অসাধারণ নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছিল, যা দেশে অনেকের কাছে এমন কী অনেক বিদেশি রাষ্ট্রের কাছেও অভাবনীয় মনে হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেন মানুষকে বাঁচাতে হলে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিকল্প নেই এজন্যই স্বাধীনতার পরপরই ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন।

১৫ ই আগষ্ট ১৯৭৫ ঃ

মহান বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধু জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করেন এবং জাতিকে এগিয়ে নিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে থাকেন। কিন্তু ১৫ ই আগষ্ট ১৯৭৫ সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে জাতি গঠনের এ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্তকরা হয়। ভুলুণ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত দেশি-বিদেশি চক্রের ষড়যন্ত্রে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে কিছু দেশী-বিদেশী শক্তি স্বাধীনতা যুদ্ধকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। এই শক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা শুরু থেকেই বিভিন্ন ধরণের ষড়যন্ত্রমূলক এবং ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপ ও অপপ্রচার শুরু করে। ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান যে বঙ্গবন্ধু হত্যা চক্রান্তের সাথে জড়িত ছিলেন তা স্পষ্ট হয় ১৯৭৬ সালে বিলাতের আইটিভি চ্যানেলের World in Action প্রোগ্রামে সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে দেয়া লে. কর্ণেল (অব) ফারুক এবং রে. কর্ণেল রশীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। সাক্ষাৎকারে ফারুক ও রশীদ দাবি করে যে, বঙ্গবন্ধু হত্যা চক্রান্তের বিষয়ে ১৫ আগষ্টের বহু পূর্বেই তারা জিয়াকে অবহিত করেছিল। ফারুক জানায়, ২০ মার্চ ১৯৭৫ সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটের দিকে সে জিয়ার বাসায় তার সাথে দেখা করে এবং তাকে বলে, “The country required a change” । উত্তরে জেনারেল জিয়া বলেন,“Yes, yes,lets go outside and talk”। জিয়া ফারুককে নিয়ে বাইরে বাড়ীর লনে যায়। ফারুক পুনরায় বলে,”We have to have a change. We, the junior officers, have already worked it out. We want your support and leadership”। জিয়া প্রত্যুত্তরে বলে, “If you want to do something, you junior officers should do it yourself..”।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর(অবঃ) হাফিজের বক্তব্যে জিয়ার জড়িত থাকার বিষটি আরো স্পষ্ট হয়েছে। মেজর(অবঃ) হাফিজ তখন সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার খবর শুনে তিনি এবং কর্ণেল শাফায়াত জামিল অফিসে যাবার পথে সেনাবাহিনীর তৎকালীন উপ-প্রধান জেনারেল জিয়ার বাসভবনে যান। কলিংবেল চাপলে জেনারেল জিয়া বেরিয়ে এলেন, পায়জামা ও গেঞ্জি পরা, গলায় টাওয়েল ঝুলানো,মুখে সেভিং এর জন্য সাবান লাগানো। কর্ণেল জামিল জেনারেল জিয়াকে বলেন,“The President has been killed, Sir. What are your orders?” উত্তরে জিয়া বলে, “If the

President is no longer there, then the Vice President is there. Go to your headquarters and wait there”।

হত্যাকারী জুনিয়র সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ না দিয়ে জিয়া তার অধস্তন সেনা কর্মকর্তাদের তাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে গমন করতে নির্দেশ প্রদান করে। বঙ্গবন্ধু হত্যা চক্রান্তের বিষয়ে জিয়া যে পূর্বেই অবহিত ছিল, তা তার বক্তব্যে স্পষ্ট হয়। জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিদেশে বিভিন্ন দূতাবাসে এবং সরকারী পদে নিয়োগ দিয়ে পুরস্কৃত করে এবং তাদেরকে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার থেকে অব্যাহতি দিয়ে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়। তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পুনরুত্থান ঃ

স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করে পাকিস্তানী ভাবধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী চক্র এক আদেশে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীর মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য ১৯৭২ সালের দালাল আইন বাতিল করে এবং ১১ হাজার সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধীকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৭৬ সালের ১৮ জানুয়ারি দেশত্যাগী পাকিস্তানি নাগরিকদের নাগরিকত্ব ফেরত পাবার জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে বলা হয়।

১৯৭৬ সালের ৩ মার্চ জেনারেল জিয়া এক সামরিক ফরমান বলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠিত করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ঘোষণা করেন।

১৯৭৬ সালের ৩ মে জিয়াউর রহমান এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সংবিধানের ৩৮নং অনুচ্ছেদ বাতিল করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নষ্টপথ উন্মোচন করেন। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের শর্তাবলী তুলে দেওয়া হয়। সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদ তুলে দিয়ে দালালদের ভোটার হওয়ার ও সংসদে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। যার ফলে স্বাধীনতাবিরোধী মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, পিডিপি, নেজামে ইসলামসহ অপরাপর ধর্মভিত্তিক উগ্রসাম্প্রদায়িক দলসমূহ তৎপরতা শুরু করে। পুনর্বাসিত হয় যুদ্ধাপরাধী মানবতাবিরোধী অপরাধের সাথে জড়িত রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সদস্যরা।

জিয়া কুখ্যাত স্বাধীনতাবিরোধী শাহ আজিজকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী করেন। এই শাহ আজিজুর রহমান ’৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে গিয়ে বলেছিল, ‘পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে হামলা চালিয়ে অন্যায় কিছু করেনি। স্বাধীনতার নামে সেখানে যা চলছে, তা হলো ভারতের মদদপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উচিত সেটাকে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার হিসেবে গ্রহণ করা।’জিয়ার মন্ত্রিসভায় আরও বেশ কয়েকজন রাজাকার ছিলেন। এরা হলেন মসিউর রহমান, সামসুল হুদা, মির্জা গোলাম হাফিজ, শফিউল আলম, আবদুল আলিম, আবদুর রহমান বিশ্বাস। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আবদুল আলিম, মসিউর রহমান, শাহ আজিজুর রহমানকে পাকিস্তানের দালাল হিসেবে জেলে পাঠানো হয়েছিল।

১৯৭৮ সালের ১১ জুলাই তিন মাসের ভিসা নিয়ে পাকিস্তানের পাসপোর্টে গোলাম আজম ঢাকায় আসে। তার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও জিয়া সরকার তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। গোলাম আজম আড়ালে থেকে জামাতের হয়ে কাজ চালিয়ে যায়। একসময় গোলাম আজমকে জামাতের আমির বলে ঘোষণা দেওয়া হয়।

১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জেনারেল জিয়া প্রায় ২৫০ জন স্বাধীনতা বিরোধীকে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তে গড়া বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। জিয়া জাতীয় সংসদে যেমন মুক্তিযোদ্ধা আর পাকিস্তানি দালালদের একই আসনে বসান তেমনি প্রণোদনা স্বরূপ ‘জয় বাংলা’ ধ্বনিকে জিন্দাবাদে পরিণত করার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চালাতে থাকেন। ৭৫ পরবর্তি জিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নেয়া। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, তিনি কি দেশপ্রেমের টানে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন না পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছিল? জিয়ার মৃত্যুর পর একাত্তরের খুনি-ধর্ষক-রাজাকারদের বাংলার মাটিতে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করে বেগম খালেদা জিয়া। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করলে তিনি হন প্রধানমন্ত্রী। সেসময় স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই রাজাকারদের পদায়ন অব্যাহত রাখেন তিনি। রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দেন স্বাধীনতা বিরোধী তালিকাভুক্ত রাজাকার আবদুর রহমান বিশ্বাসকে।

শুধু তাই নয়, রাজাকার সর্দার গোলাম আজমের নিশ্চিত জীবনযাপনের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। এমনকি তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন এবং পুরোদমে রাজনীতি করার সুযোগ দেন। ২০০১ সালে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়ে খালেদা জিয়া ১৯৭১-এর আল বদর ও আল শামস বাহিনীর দুই শীর্ষ নেতা মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মুজাহিদকে মন্ত্রিত্ব দেন। বাংলাদেশের পতাকাবাহী গাড়ি থেকে নেমে প্রকাশ্য গণমাধ্যমে মুজাহিদ দম্ভ করে বলে, 'বাংলাদেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নাই।' এসময় দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও উগ্রবাদী

গোষ্ঠীর অপতৎপরতা বাড়তে থাকে। বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশ জঙ্গি রাষ্ট্রের তকমা পায়।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাঙালীর মুক্তি সনদ ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর মহানায়কোচিত ভূমিকা- এ সবকিছুই বাঙালির রাজনৈতিক জীবনাদর্শনকে একটি পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছে। মৃত্যুতে তাঁর সমাপ্তি ঘটেনি। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং স্বাধীন বাঙালিজাতির জনক। তাই বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ বাঙালি জাতির কাছে এক ও অভিন্ন নাম। সেজন্যই বঙ্গবন্ধুসম্পর্কে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর সেই বিখ্যাত মন্তব্য,"আই হ্যাভ নট সিন দ্য হিমালয়েজ। বাট আই হ্যাভ সিন শেখ মুজিব। ইন পারসোনালিটি অ্যান্ড ইন কারেজ, দিস ম্যান ইজ দ্য হিমালয়েজ। আই হ্যাব দাজ হ্যাড দ্য এক্সপিরিয়েন্স অব উইটনেসিং দ্য হিমালয়েজ।

মোঃ আলি আখতার হোসেন
এফ/০৫৮০২

বঙ্গবন্ধু'র গ্রামীণ উন্নয়নের দর্শন

এই উপমহাদেশে অনেক বিখ্যাত ও স্মরণীয় নেতার জন্ম হয়েছে। কিন্তু যে ক'জন মহান বাঙালি তাদের মেধার উৎকর্ষতা, প্রজ্ঞা, সময়োপযোগী ও গতিশীল নেতৃত্বে এবং সুনিপুণ চিন্তা-ভাবনার আলোকচ্ছটায় বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অধিকার আদায়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণা যুগিয়েছেন, তাদের মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছেন শত-সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি শুধু একটি নাম নয়, একটি ইতিহাস, বাংলাদেশের নির্মাতা।

বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতো নেতা আর দ্বিতীয় কেউ জন্ম নেননি। কারণ, তিনি ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে বাঙালি জাতির জন্য একটি জাতিরাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছেন। ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে তিনি বাঙালি জাতিকে শুধু একটি দেশই উপহার দেননি; সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি ভঙ্গুর অর্থনীতির রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো কেমন হবে-তারও একটি যুগোপযোগী রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু উন্নয়ন ভাবনার ব্যাপ্তি ছিল সর্বত্র এবং তা ছিল সার্বজনীন, অব্যর্থ ও কালজয়ী।

বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে উন্নয়ন দর্শন। বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন, রাজনৈতিক দর্শন এবং উন্নয়ন দর্শন পরস্পর সাথে সম্পর্কযুক্ত। বঙ্গবন্ধুর পলিটিক্যাল ফিলোসফি বা রাষ্ট্রদর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মানবতাবাদী অসাম্প্রদায়িক চেতনায় শোষণমুক্ত- বৈষম্যহীন উদার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে- "আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।" সংবিধানের শীর্ষে সংযুক্ত প্রস্তাবনার এই গুরুত্বপূর্ণ অংশে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের মৌলিক ভিত্তিগুলো পাওয়া যায়।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের বিভিন্ন উৎস পাওয়া যায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণ, আওয়ামী লীগের ঘোষিত কর্মসূচি, ১৯৭০ এর নির্বাচনী ইশতেহার, ১৯৭২ এর মূল সংবিধান, ১৯৭২-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর নানাবিধ গৃহীত পদক্ষেপ, তাঁর গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' 'কারাগারের রোজনামচা' 'আমার দেখা নয়া চীন' গ্রন্থসহ বিভিন্ন গবেষণাধর্মী পত্রিকা ও নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাঁর উন্নয়ন দর্শন সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা ও প্রায়োগিক দিকগুলো ফুটে ওঠে।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের মূলে ছিলো উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা তথা "সোনার বাংলা" গড়ে তোলা। এটি একটি বিস্তৃত দর্শন যার আওতায় ছিল আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন ও বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে গণমানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করা। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনায় ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, বয়স-পেশা নির্বিশেষে সব মানুষের সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মানুষের জীবনমানের পরিবর্তন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিল্পের বিকাশ, কৃষির আধুনিকায়ন, উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করা, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি বাঙালি জাতিকে তথা বাংলাদেশকে আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

বঙ্গবন্ধু বৈষম্যহীন সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি অসাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করে গেছেন। বিশ্ববিখ্যাত আইনজীবী ও নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী সন ম্যাকব্রাইড বলেছিলেন, শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন,স্বাধীনতা শুধু পতাকা পরিবর্তন ও দেশের নতুন নামকরণ বোঝায় না, তাঁর দৃষ্টিতে স্বাধীনতার অর্থ হলো সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও নীতিবোধ সম্পন্ন আদর্শবাদ। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেন আদর্শবাদ নাগরিকের মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কাঠামো তৈরি করতে হবে, রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিতে হবে। পাশাপাশি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের সমন্বয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়ন কাঠামো হতে হবে পরিকল্পিত।

স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ী উদ্যোগকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে উত্পাদন খাত, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনব্যবস্থাসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হিসেবে সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু তার বিভিন্ন বক্তৃতায় সমবায়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং দেশের জনগণকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সেই সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে-কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লির কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশপাশে আর অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার, আসুন সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রামবাংলাকে জাগিয়ে তুলি।'

বঙ্গবন্ধু মানুষে মানুষে বৈষম্য ও আঞ্চলিক বৈষম্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল কারণই ছিল আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং বাংলাদেশকে শোষণমুক্ত করা। এ সম্পর্কে খুবই স্পষ্ট ভাষায় তিনি বৈষম্যের ফিরিস্তি দিয়েছিলেন ১৯৭৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সিরাজগঞ্জের এক জনসভায়। এ বৈষম্যের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে তোমরা ৮৫ জন, আমরা ১৫ জন, সামরিক বিভাগে তোমরা ৯০ জন, আমাদের দিয়েছে ১০ জন। বৈদেশিক সাহায্যের তোমরা খরচ করেছ ৮০ ভাগ, আমাদের দিয়েছে ২০ ভাগ। মহাপ্রলয়ে দক্ষিণ বাংলার ১০ লাখ লোক মারা গেল। লাখ লাখ লোক অসহায় অবস্থায় রইল। রিলিফ কাজের জন্য বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার এসে কাজ করে গেল। অথচ ঢাকার একখানা মাত্র সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর কোনো হেলিকপ্টার এলো না। আমরা এসব বেইনসাফির অবসান করব।' এর জন্যই তিনি স্বাধীন দেশের সংবিধানে 'সমাজতন্ত্র' কথাটি সংযুক্ত করেছিলেন রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে। বঙ্গবন্ধু দেশের গ্রামীণ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ও বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠার বিপ্লবকে একসঙ্গে গ্রথিত করেছেন। একটির সঙ্গে অপরটি সংযুক্ত, একে অপরের পরিপূরক।

স্বাধীনতা উত্তর দেশের শতকরা ৯০ ভাগের বেশি মানুষ গ্রামে বাস করতো। তাদের অধিকাংশই ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন, শ্রমিক ও দিনমজুর। অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। বিপুল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। এ সময় গ্রাম উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেন, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি জমিতে সেচ ও সারের ব্যবহার বৃদ্ধি, শস্য উৎপাদন বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রাম সমবায়, ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ, গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং কাজের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য গ্রামীণ কুটির শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান। তিনি প্রণয়ন করেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: যার মূল বিষয় ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। এছাড়া বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশের সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার যুক্ত করেছিলেন।

গ্রামকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মূলকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করতেন। ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন- "গ্রামের দিকে নজর দিতে হবে। কেননা গ্রামই উন্নয়নের মূলকেন্দ্র। গ্রামের উন্নয়ন আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যখন বেগবান হবে তখন গোটা বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সম্মুখপানে।" পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরেই তিনি স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনে ঐক্যের ডাক দেন। দেশ পুনর্গঠনের ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেন।

বঙ্গবন্ধু মুজিব উন্নয়ন পরিকল্পনা যেমন গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নানামুখি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য, সোনার বাংলা বিনির্মাণে সক্রিয় অংশীদার হওয়ার জন্য। তারই ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নের বাস্তবতায় তিনি অর্থনৈতিক কাঠামো একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সফলতাও পেয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু ১৯৭৫ সালে ঘাতকদের নির্মম বুলেটে প্রাণ হারান বঙ্গবন্ধু, আর স্থবির হয়ে পড়ে তার সকল কার্যক্রম। পরবর্তীতে ইতিহাসের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে দৃঢ় পদক্ষেপ নেন। তার নেতৃত্বে বিগত এক দশকে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৭৬৫ মার্কিন ডলার। দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার কমেছে। বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে পরিচিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) পেশাদারি উৎকর্ষ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। এলজিইডি স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসসহ পল্লি ও নগর উন্নয়নে শক্তিশালী ভিত নির্মাণ করে চলেছে।

গত চৌদ্দ বছরে (২০০৯-২০২২) পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র অর্জন অনেক। এলজিইডি সরকারের রূপকল্প ২০৪১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য ২০৩০, বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর আলোকে দেশব্যাপী টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষার মানসূচকগুলো অনুসরণ করে পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরে এলজিইডি'র কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ' বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করছে এলজিইডি; যা ভিন্ন উচ্চতার বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাইলফলক উদ্যোগ। আইএফপিআরআই-বিআইডিএস এর গবেষণা প্রতিবেদনের অনুসারে এলজিইডি কর্তৃক গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে মোটরাইজড যানবাহনের জন্য ৬০% ও নন-মোটরাইজড যানবাহনের জন্য ট্রাভেল টাইম হ্রাস পেয়েছে, পাট, ধান উৎপাদন ১৮০% বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বাস্থ্য সেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা সুবিধা ৩৭% বৃদ্ধি পেয়েছে, ছেলেদের জন্য স্কুলে উপস্থিতি ২৪% এবং মেয়েদের জন্য ৫৯% বৃদ্ধি পেয়েছে, দোকান/শিল্প বৃদ্ধি ২৪% পেয়েছে, মার্কেটের বার্ষিক লিজ মানি ৩৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান সরকার জাতির পিতার দর্শনভিত্তিক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে আস্থার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী উন্নয়নের শক্ত ভিত্তি নির্মাণ করে চলেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে তীব্র আকাঙ্খা জাতি প্রকাশ করেছে সেই অভিলক্ষ্যে পৌঁছাতে বর্তমান সরকার কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামো বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

প্রকৌ: মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার
প্রধান প্রকৌশলী
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।
এফ/০৯৬০১

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন: আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকবর্তিকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা দর্শন এবং শিক্ষা ভাবনা তাঁর রাজনৈতিক দর্শন থেকেই উৎসারিত। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক মতাদর্শ, রাজনৈতিক দীক্ষা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, আত্মত্যাগ, সংগঠন, সমাজচিন্তাসহ জীবনের সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রে রয়েছেন বাংলাদেশের মানুষ। তাঁর ৫৫ বৎসরের জীবনকালে একটি আধুনিক, কল্যাণকর শিক্ষাব্যবস্থা গঠনের পথনির্দেশ করে তিনি সার্বিকভাবে একটি আত্মনির্ভরশীল, সুদক্ষ, কারিগরি জ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন একটি জাতি গঠনের দিক নির্দেশনা-প্রদান করে এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তিনি বলতেন সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। তাই তিনি সোনার মানুষ গড়ার জন্য আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ছিল স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি শিক্ষাদর্শন যেটি তিনি স্বাধীনতার পূর্বেই, পাকিস্তানী শাসন আমলে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর এ শিক্ষাদর্শন ছিল সুদূরপ্রসারী, ব্যাপক, তাৎপর্যপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। এর মূল লক্ষ্য ছিল জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। তাঁর শিক্ষা চিন্তা বর্তমান সময়েও শুধু বাংলাদেশেই নয় উন্নয়নশীল সকল দেশে শিক্ষা সংস্কারের পাথেয় হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। সাধারন শিক্ষাব্যবস্থা ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি কাঙ্খিত মানব মুক্তির কাঠামো প্রদানে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আজও তা উজ্জল আলোকবর্তিকা হয়ে দেদীপ্যমান আছে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষাকে একটি হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করতেন। তিনি জানতেন শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে এবং জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশ বিভাগ উত্তর যে শিক্ষা ব্যবস্থা এ দেশে প্রচলিত ছিল সেটির প্রতি তিনি ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। সে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রতিটি আন্দোলনে তার সক্রিয় অবস্থান ও মনোযোগ ছিল। পাকিস্তান আমলে যতগুলো শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন হয়েছে প্রত্যেকটি আন্দোলন-সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে শিক্ষা ব্যবস্থা পাকিস্তান আমলে প্রচলিত ছিল, সেটি বাস্তব ও গণমুখী ছিল না। এর মাধ্যমে দেশ ও জাতির সর্বোপরি বাংলার চাহিদাপূরণ, জনকল্যান ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। ১৯৪৮ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানি শাসকেরা আমাদের মাতৃভাষার উপর যে আঘাত হানল, তখনই বঙ্গবন্ধু প্রতিাদী হয়ে উঠলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা না হলে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়বে। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত "শরীফ শিক্ষা কমিশন" রিপোর্টের (শিক্ষা সংকোচন নীতি) বিরুদ্ধে গড়া উঠা ছাত্র আন্দোলনে তাঁর সর্বাত্মক সমর্থন ছিল।

শতাব্দী ধরে প্রচলিত অন্তঃসারশূন্য ও আকার সর্বস্ব প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার নীতি-পদ্ধতি পরিবর্তন করে নতুন ভাবধারার প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার প্রয়াস বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা-ভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি ঔপনিবেশিক শোষন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সমৃদ্ধশালী একটি নতুন দেশ গঠনে শিক্ষাকে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে চিন্তা করেছেন। শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি গনমুখী ও সার্বজনীন ধারায় বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের চিন্তা করেছেন। বঙ্গবন্ধু ঔপনিবেশিক শাসনামলে এদেশে প্রবর্তিত ইংরেজী ঘেষা শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। কেননা আমাদের এই শিক্ষার ভিত রচিত হয়েছিল ইংরেজ শাসকদের বৈষম্য সৃষ্টির মনোভাব থেকে, সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের একটি ভ্রান্ত শিক্ষাতত্ত্বের উপর যা ১৮৩৪ সালে লর্ড জন মেকলের Downward Filtration Theory বা নিম্নগামী পরিস্রাবন নীতি ও ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য কিছু দোভাষীরূপী কেরানি তৈরী করা। এই নীতিতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিলঃ "To create a class of persons Indian in blood and colour but English in tastes in opinions and intellect"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে বলেছেন, "আমরা যে শিক্ষা আজন্মকাল যাপন করি, সে শিক্ষা কেবল যে, আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোন একটি ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র। এই শিক্ষা কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত"। শিক্ষার প্রতি বঙ্গবন্ধুর সজাগ দৃষ্টির প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতিহারে। সেখানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, শিক্ষকদের ন্যায় সঙ্গত বেতন-ভাতাবৃদ্ধি, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার ব্যবধান দূরীকরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন প্রদান, সর্বোপরি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলনের মতো উন্নয়নমূলক ধারা সংযোজনে তাঁর অবদান ছিল অবিস্মরনীয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৭০ সালের সাধারন নির্বাচন উপলক্ষ্যে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর দেয়া বেতার টেলিভিশন ভাষণ থেকে

আমরা তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে গভীর ভাবনা সম্বন্ধে পরিষ্কার একটি ধারনা পাই। তিনি বলেছিলেন সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৪ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটা "ক্লাশ প্রোগ্রাম" চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণীর জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিক্যাল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে"। "১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লক্ষেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশী শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মাত্র বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধস্ত দেশে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূর্নগঠন, আদর্শ নাগরিক তৈরী, কর্মমূখী ও বাস্তব উপযোগী বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা সমূহ দূর করে একটি মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রথিতযশা ও বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ কদুরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একদল শিক্ষাবিদদের নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষা কমিশনের সদস্যগনকে, বাংলাদেশের জনগনের বঞ্চিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির জন্য পূর্নগঠিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে তাদের সুচিন্তিত পরামর্শ দানের আহবান জানান। তিনি আরও বলেন, আমাদের সীমিত সম্পদের কথা স্মরণ রেখে কমিশন শিক্ষার এমন এক দীর্ঘমেয়াদী রূপরেখা প্রণয়ন করবেন যা শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থক ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার সাধনে সাহায্য করবে। ১৯৭৪ সালের ৩০ মে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন একটি রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্টে জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে একটি স্বল্প মেয়াদী ও একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার কথা প্রস্তাব করা হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় এ রিপোর্ট বাস্তবায়নের কাজও শুরুকরে দিয়েছিলেন।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল অপরিসীম। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে দেশের প্রয়োজনে ঢেলে সাজাতে বঙ্গবন্ধু নিয়েছিলেন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। ১৯৭০-র নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সর্বোচ্চ মান রাখা এবং মেধার ভিত্তিতে সকল শ্রেণীর জনসাধারনের জন্য শিক্ষার পথ খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা অর্ন্তভূক্ত ছিল। বঙ্গবন্ধু সর্বদাই চাইতেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পূর্ন স্বাধীনতা উপভোগ করুক। স্বাধীন রাষ্ট্রে এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নসহ উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্য বঙ্গবন্ধু কালক্ষেপন না করে ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ঘোষনার মাধ্যমে তৎকালীন সময়ের ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যাপক স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন এবং ধনী গরীবের বৈষম্য দূর করলেন। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পঠিতব্য কারিকুলাম, একাডেমিক বিষয়াদি, সার্বিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ পরিচালনা ও দেখভালের জন্য তিনি "বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন" গঠন করেছেন।

বঙ্গবন্ধু চাইতেন জাতীয় উন্নয়নে দেশের সকল নাগরিকের সমঅংশীদারিত্বের সুযোগ সৃষ্টি হউক, আর এটা হবে একটি রাষ্ট্রিয় দায়িত্ব। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন, যে কোন দেশের মানবসম্পদকে মানব পুঁজিতে পরিনত করে উন্নয়নের মূলধারায় অংশগ্রহণে সক্ষম নাগরিকে পরিনত করার জন্য প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী জনশক্তি পরিকল্পনা। আর এ জন্য তার স্বপ্নের বৈষম্যহীন সোনার বাংলা গঠনে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। এসবদিক বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২-র সংবিধানে একটি বৈষম্যহীন গণমুখী একইধারার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক (১৯৭০-৭৪) পরিকল্পনায় প্রতিরক্ষা খাতের চেয়েও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ সবচেয়ে বেশী রেখেছিলেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ আর ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর পর শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

০১. প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ আইন প্রণয়ন
০২. ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন।
০৩. ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করন ও কয়েক লক্ষ শিক্ষক-কর্মচারীকে সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা প্রদান,
০৪. ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বহু সংখ্যক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা,
০৫. গণশিক্ষায় আলাদাভাবে অর্থ বরাদ্দ,
০৬. কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও জাতীয় গ্রন্থাগার গঠন
০৭. ১৯৬২ সালে আইয়ুব সরকার প্রণীত অধ্যাদেশ (যা"কালো আইন"নামে অভিহিত) বাতিল করে ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারী।
০৪. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার
০৯. নারী শিক্ষার প্রসার।
১০. কৃষি, চিকিৎসা, বাণিজ্য, আইন, ললিতকলা প্রভৃতি জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষার জন্য পৃথক বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ।

"শিক্ষাই হবে মুক্তির হাতিয়ার" -বঙ্গবন্ধুর দেয়া শিক্ষার এ নবতম ব্যাখা থেকেই এদেশে জন্ম নিয়েছে আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক সার্বজনীন শিক্ষার আধুনিক পথ নকশা। বঙ্গবন্ধু নিজে ছিলেন প্রগতিপন্থী। তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিও ছিল প্রগতিপন্থী। এছাড়াও তিনি শিক্ষাকে সমাজধর্মী করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। "মৌলিক শিক্ষা রাষ্ট্রের কর্তব্য" তাঁর এই ধারনায় প্রাথমিক শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করে তিনি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষাকে একটি হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করতেন। তিনি জানতেন শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে এবং জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমে দেশ ও জাতির চাহিদা পূরণ, জনকল্যাণও সমৃদ্ধি সম্ভব। বাস্তবমুখী শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল আজীবন। বাংলাদেশের শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

মোসাম্মত সামিনা
পোস্ট গ্রেজুয়েট, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
এম/৩৬৯৫৩

কার্ড নির্ভর লেনদেনে সহজ জীবন

ঢাকা এত ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা যে এখানে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা। ঘর বাড়ি থেকে অফিস আর আড্ডায় পকেট ভর্তি করে চলাফেরা করা খুব মশুকিল। যান্ত্রিক জীবনে মানুষের সস্তির নিশ্বাস ফেলার সময় বের করা যায় না। বাজার করা থেকে শুরু করে ব্যাঙ্ক এর বথু থেকে সিআরএম এর মাধ্যমে টাকা জমা থেকে উঠানো আর বিকাশের টাকা পর্যন্ত উঠিয়ে ঢোকানো সমস্ত কিছুতে ই-কার্ড ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কার্ড ছাড়া যেন আমাদের চলেই না। এটা হারিয়ে গেলে মনে হয় কী যেন নেই, কে যেন নেই! ঘুম থেকে উঠে কার্ড এর সর্বশেষ অবস্থা দেখি মুঠোফোনে । আজকাল কার্ড এর অবস্থান আকাশ ছোয়া। কাজে কর্মে চিন্তায় চেতনায় লোক সমাজ কাঠামোয় কার্ড নিয়ে না চলা মানুষ পাওয়া যায় না। যানজটের পরে দ্বিতীয় সমস্যা যদি শুনি বাচ্চাদের স্কুল, পড়ালেখা, তৃতীয় সমস্যা নিঃসন্দেহে কার্ড। এদেরকে পরিচালনা করতে যেয়ে জীবনের আয়ু অর্ধেক শেষ। সর্বোপরি , আজকাল বিশ্বস্ত কোন মানুষ পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি, বিভিন্ন সূচকে অগ্রগতি, সর্বাধুনিক সেবা চালু, স্মার্ট ব্যাংকিং সেবায় অগ্রগতি সহ ব্যাংকের বিভিন্ন অর্জন ও সম্ভাবনা নিয়ে জাতীয় দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক প্রথমআলো ও দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকায় ব্যাংক পিএলসির আলোচনা। কার্ড এর পরিধি যে মন বাড়ছে মানুষের চাহিদাও দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । চাহিদার কথা মাথায় রেখেই জীবন আর জীবিকার অংক কষে নির্মার্মণাধীন সমস্ত কার্যক্রম এর কার্ড হয়েছে মানুষের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিবিধ ফি ও চার্জ আদায়ের লক্ষ্যে কার্ড সর্বত্র ছড়িয়ে আছে । শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে অনলাইনে পেমেন্ট গেটওয়ে যে মন বিকাশ, নগদ ব্যবহার করে যাবতীয় ফি , বেতন ও চার্জ পরিশোধ করতে পারে । এছাড়া দিন রাত যে কোন সময় ব্যাংকিং লেনদেন করতে পারে কার্ড এর মাধ্যমে । পত্রিকা অথবা ম্যাগাজিন পড়ার জন্য অন্যদিকে রকমারি অথবা প্রথমা থেকে বই কেনার ক্ষেত্রে কার্ড কতটা সুবিধা দিচ্ছে অনলাইনে অথবা অফলাইনে ।

নারীদের নিরাপদ আর সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য কার্ড অপরিসিম ভূমিকা রাখছে । গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে বৈদেশিক টাকা উঠানো অথবা জমার জন্য কার্ড এর ভূমিকা অপরিসিম। যদি ও এটিএম বথু এর সংকট তারপর ও মানষু নিয়মিত কার্ড ব্যাবহার করে এর সুবিধা পাচ্ছে ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মার্মণে সক্রিয় অংশীদার হিসেবে ব্যাংক পিএলসি কার্ড নিরবিচ্ছিন্ন কাজ করে যাচ্ছে । প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কার্ড এর ব্যবহার বেড়েছে । আপনি ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে চেকবিহীন নগদ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে শিক্ষকমন্ডলী সবাই কার্ড এর মাধ্যমে বেতন পরিশোধ করতে পারছে আর তুলতে পারছে নিজের হাতে । আর বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট গুলোতে কার্ড এর মাধ্যমে পেমেন্ট করলে হরেক রকম ডিসকাউন্ট এর সুবিধা দেয়। দিনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৬ ঘন্টা বাদে সবসময়ই কার্ড এর ব্যাবহার হচ্ছে ।

দূরে কোথাও ঘুরতে গেলে টাকা বেশি নিয়ে হারিয়ে যাওয়ার চিন্তা অনেকটা কমে গিয়েছে শুধু ছোট্ট একটা কার্ড পকেটে রাখার মাধ্যমে । চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যাংকের কার্ডের গুরুত্ব অপরিসীম। বাহিরে থেকে রেমিটেন্স আসার সুন্দর একটা মাধ্যম এই কার্ড। ফ্রিল্যান্সারদের কাজের দিগুন পরিমাণ উৎসাহ দিয়ে থাকে এই কার্ড।

সব কিছুর পরে ও আমরা ভাবতে পারি না, কার্ড বিহীন জীবন। আমাদের নিজেদের ঘরের কাজ আমরা কার্ড দিয়ে নিজেরাই অতি দ্রুত শেষ করে ফেলি । ভয় না পেয়ে , মাথা খাঁটিয়ে উপায় বের করি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাবহার করা যায়। আর হ্যাঁ, এ ব্যাপারে অবশ্যই অবশ্যই বাড়ির কর্তা, কর্তী , ছেলে , মেয়ে সবাইকে দায়িত্ব নিতে হয়। বাড়ির বা সংসারের বা কর্মক্ষের্মক্ষেত্রে সব কাজ কার্ড দিয়ে করা সম্ভব।

প্রকৌশলী মো: নওসাদ আলী পিইঞ্জ
অতি: প্রধান প্রকৌশলী (অব:)
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
এফ/০৩০৪৮

শোকগাথা

বাঙ্গালীর জীবনে বারেবারে আসে
পলাশীর ট্রাজেডি,পনের আগষ্টের
ভয়াবহতম বিভীষিকাময় ট্রাজেডি,
জেলহত্যা ট্রাজেডি যে সর্বনাশে
বাঙ্গালী ডুবেছে সে সব শোকগাথার
রক্তলিখন কীভাবে লিখবো তাই ভাবছি!

একটি মহীরুহ উপড়িয়ে ফেলার সাহস
দেখিয়েছে উঁইপোকারা। মোগলের
প্রাসাদ গ্রাস করবার অনাহারী আগ্রাসন চালিয়েছে যমুনার বর্জ্যময়
অচল অথৈ জল।বজ্র বিদ্যুৎ গ্রাস করেছে তমসাচ্ছন্ন ভৌতিক কুয়াশা।
পৃথিবীতে এমনটিও ঘটেছে বারেবার কত যুদ্ধের মহানায়ক বীর বোনাপার্ট নেপোলিয়ন শেষে কিনা পরাজিত হোলেন অখ্যাত বৃটিশ ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে। এ সকল শোকগাথা মুজিব হত্যার পনের আগষ্টে এসে ম্লাণ হয়ে যায়।কলম বিদ্রোহ করে,বল্লম হতে চায়, প্রতিশোধের ক্রোধ ঝরে পড়ে কবিতার পাতার কালি হয়ে যায়।

ষড়যন্ত্র যত ছোটই হোক,তার প্রলয় ক্ষমতা অতীব মারাত্মক।তাই যে কোন অপরাধ ক্ষমা করা গেলেও ষড়যন্ত্রকারীকে ক্ষমা করতে নেই। ইতিহাস তাই বলে। ঔরঙ্গজেব ক্ষমা করেননি আপন সহোদরদের। এমনকি গ্রীস সম্রাট ইডিপাস ক্ষমা করেননি স্বয়ং নিজেকেও। সফেক্লিস নিজেও পারেননি এতবড় ট্রাজেডি হাতে থাকা সত্তেও মহাকাব্য রচনা করতে।শোকগাথা কখনো মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করা দায় বটে।

আচ্ছা বলো, শিশু রাসেলের রক্তঝরার তীব্রস্রোতে সিক্ত সোঁদামাটিতে যে রক্তগোলাপ ফোটে,তাকি বিদ্রোহের কন্টকে আচ্ছাদিত না হয়ে জন্মাতে পারে? শত বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর বজ্রকণ্ঠ কি বজ্রপাতের আকাশফাটা আর্তনাদ না হয়ে বাংলার প্রকৃতিতে আছড়ে পড়তে পারে? বড় শোকগাথা কি শুধু নীরব অশ্রুমোচনের মাতৃদহন হতে পারে? পারেনা বলেই শোকগাঁথা কখনো কখনো বিদ্রোহী কবি নজরুলের অগ্নিবীণাতে পরিনত হয়।
স্বজনহারা হাসিনার রক্তশপথে সীমারকে ফাঁসির মঞ্চে আহাজারিতে রক্তধারার শেষ স্বেদবারি ঝরাতে হয়।
প্রত্যেক নির্দোষ খুনের বিচার হতে হবেই, সকল শহীদের উদ্দেশ্যে আমার এই শোক গাথা।

প্রকৌশলী শেখ শরিফুল ইসলাম
প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট
এম/৩৯০৯৪

মহানায়কের সোনার দেশ

হে জাতির পিতা, তুমি দীপ্ত-দুরন্ত নিরন্তর,
তুমি ছিলে অবিচল এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর;
তুমি শুধু এই বাংলার নও হে বন্ধু,
তুমি সারা বিশ্বের অহংকার।
তুমি এসেছিলে এই শস্য-শ্যামল বাংলায়,
শোষিত বাঙ্গালীর মুক্তির বার্তা নিয়ে;
ধন্য বাঙ্গালী-ধন্য বাংলা তোমার আহবানে,
তুমি বেঁচে আছো লাল-সবুজ পতাকার মাঝে।
তোমার বজ্র কণ্ঠের আওয়াজে কেঁপেছে বিশ্ব,
জেগেছে বাংলার মেহনতি জনতা;
তোমার দৃঢ়তায় হলো শত্রুর শেষ,
আমরা পেয়েছি সোনার বাংলা, বাংলার স্বাধীনতা।
আজ তোমার জন্মশত বর্ষে শুভেচ্ছা তোমায়,
হে মহানায়ক-হে পিতা-হে বন্ধু;
হারিয়েছি তোমায়, বড় অবেলায়-অবহেলায়,
তাই তো এ জাতি বার বার তার লক্ষ্য হারায়।
তবুও আশায় বাধি বুক-উঠবে নতুন সূর্য,
আসবে নতুন ভোর, ছড়াবে আলোর দ্যুতি;
তোমার বাংলা হবে সোনার দেশ-স্বপ্ন হবে সত্যি,
আমরা হব আগামী দিনের উন্নত এক জাতি।
তোমার নাম লেখা আছে আজো কোটি প্রাণে,
ঘাতকের মরণ ঘনিয়ে এখন এগিয়ে চলেছে দেশ,
শোক আজ শক্তি- তুমি থাকবে জীবনের জয়গানে,
তোমার "দাবায়া রাখতে পারবা না" শব্দে হবে শত্রুরা নিঃশেষ।

অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. ইকবাল মাহমুদ
এফ-১২৯০৪

'৭৫-এর হত্যাকান্ড এবং কিছু জিজ্ঞাসা

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট
সুবহে সাদেকের ঠিক পূর্বক্ষণে,
বাংলাদেশে নৃশংস এক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল
পাকিস্তানি চরের বুলেট সেদিন,
স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতিকে হত্যা করেছে।
ঘাতকের বুলেট সেদিন,
বাঙালি জাতির পিতাকে হত্যা করেছে।
আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীর বুলেট সেদিন,
বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে।
মীরজাফরের বংশধরের বুলেট সেদিন,
বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতাকে হত্যা করেছে।
'৭১-এর পরাজিত শত্রুর বুলেট সেদিন,
মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করেছে।
বিশ্বমানবতার শত্রুর বুলেট সেদিন,
মানুষ হত্যা করেছে।
নমরুদের প্রেতাত্মার বুলেট সেদিন,
নারী ও শিশু হত্যা করেছে।
ইসলামের ছদ্মবেশ সেদিন,
মুসলমান ও শেষ নবীর উম্মত হত্যা করেছে।
তাই-
বিশ্বমানবতার কাছে, বাঙালির কাছে
মুক্তিযোদ্ধার কাছে, মুসলমানের কাছে
সবিনয়ে জিজ্ঞাসা,
বিশ্বমানবতার কলঙ্কজনক পৈচাশিক হত্যাকান্ডের
স্ব-ঘোষিত নরপিচাশরা কি;
জাতিসংঘ এবং ওআইসি'র সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের
আশ্রয়-প্রশ্রয় পাবে?
বাঙালি জাতি কি এ নির্মম হত্যাকান্ডের বিচার না করে
জাতির অর্জিত মান-সম্মান বিশ্ব দরবারে ম্লান করবে?
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হত্যায় মুক্তিযোদ্ধারা কি
'৭১-এর মতো গর্জে উঠবে?
নাকি, '৭১-এর পরাজিত শত্রুর সাথে আপোষ করে
নিজের ভাগ্য গড়বে।
পবিত্র কোরআনের নির্দেশ মতে,
হত্যাকান্ডের বিচার না হলে,
হত্যাকরীকে ঘৃণা না করলে
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশের মুসলমানেরা,
শেষ বিচারের দিন কি জবাব দিবে?

With due respect and solemnity we remember the National Mourning Day-2023 of our Father of Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

About us

BCL Associates Limited, commonly known as BCL, is the oldest and largest continuously working consulting engineering firm in Bangladesh. BCL is a multi-disciplinary, ISO 9001 and 14001 certified practice and has rich experience in engineering, construction supervision and project management of major road, bridge, building, energy and power, water resources, socio-economical, environmental, resettlement, agriculture, urban development, water supply, sewerage and waste management, irrigation, drainage, flood control, port and harbor and various other infrastructure development projects. The firm has been working in South, Southeast and Central Asia and Southern Africa for over a decade beyond Bangladesh.

BCL has been active in different development works in Bangladesh since the early 80s, and has been responsible for carrying out design, supervision of construction and project management of the above-mentioned projects proving its outstanding and excellent performance with appreciation and plays vital and impressive role in execution of the projects with great reputation nationally and internationally.

BCL operates an integrated quality management system in all departments of its operation. The firm puts great emphasis on the Continuous Professional Development (CPD) of its staff members and facilitates these objectives through the CenTR, its dedicated training and research centre.

SASEC Road Connectivity Project-II

Kalna Bridge under Cross Border Road Network Improvement Project

Dhaka Elevated Expressway PPP Project

Ganja-Gazakh-Georgian Border Road Project, Azerbaijan

Sheikh Kamal IT Training & Incubation Centre

Contact us

BCL Associates Limited
Noorani Tower (2nd Floor), 1 Mohakhali C/A, Bir Uttam
AK Khandaker Sarak, Dhaka-1212,Tel:880-2-48810072-5
Email: bcl@bclgroup.com, Web: www.bclgroup.com

Water Modelling, Computational Hydraulics & Allied Sciences

World Class Expertise

All our services are supported by HRD Programme & ICT based DSS

Embankment breach in Zilker Haor

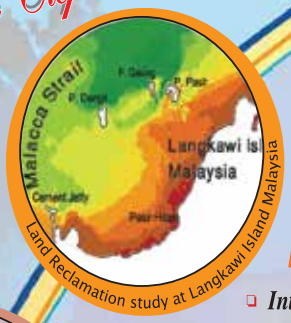

Land Reclamation study at Langkawi Island Malaysia

Technology Transfer

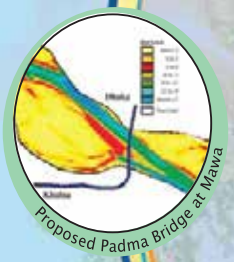
Proposed Padma Bridge at Mawa

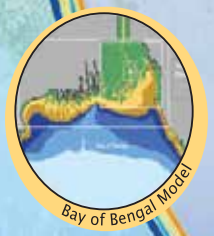
Bay of Bengal Model

Fields of Operation

- Integrated Water Resources Management
- Irrigation Management
- Urban Water Management
- Fluvial Hydraulics and River Morphology
- Flood Management
- Coastal Hydraulics and Morphology
- Estuary and Marine System Management
- Topographic, Hydraulic, Sediment Transport Water Quality and Hydrological, Meteorological field Measurments, Laboratory analysis and data Management and Mapping
- Wetland and lakes Management
- Ground Water Management
- Water Quality & Ecology
- River Engineering
- Integrated Coastal Zone Management
- Port and Coastal Structure Management
- Offshore Structure and Pipelines
- Water Quality Investigation
- Water Modelling and / or GIS Based IT Solutions

We Strive for Excellence

IWM
Water Environment & Climate

INSTITUTE OF WATER MODELLING

House 496, Road 32, New DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206, Bangladesh
Tel : (88-02) 9842105-6, 9844590-1 Fax : (88-02) 9847901
E-mail : iwm@iwmbd.org, Website : www.iwmbd.org

DDC is a Reputed Multi-disciplinary Consulting Organization Providing Quality Engineering, Architecture, Urban & Regional Planning, Environmental and Project Management Services for major Infrastructure Development in Bangladesh

DHAKA MASS RAPID TRANSIT DEVELOPMENT PROJECT (MRT LINE - 6)

Salient Project Features

Length of Metro Rail : 21.26 Km
Infrastructure Type : Elevated
Route Alignment : Uttara 3rd Phase - Pallabi to west side of Rokeya Saraoni through Khamarbari - Farmgate - Hotel Sonargaon - Shahbag - TSC - Doel Chatter - Topkhana Road - Motijheel to Kamalapur
Number of Stations and Name : 17 nos.- Uttara North, Uttara Center, Uttara South, Pallobi, Mirpur-11, Mirpur-10, Kazipara, Shewrapara, Agargaon, Bijoy Saroni, Farmgate, Karwan Bazar, Shahbag, Dhaka University, Bangladesh Secretariat, Motijheel and Kamalapur

DDC's Current Major Consultancy Projects as Joint Venture Partner

- MRT Line-6 (Design, Construction Supervision, Procurement Support and Management)
- MRT Line-1 (Construction Supervision)
- MRT Line-5 Northern Route (Detail Design, Tender Assistance and Construction Supervision)
- Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka (Detailed Design and Construction Supervision of 3rd Terminal Building)
- Bangabandhu Sheikh Mujib Railway Bridge Construction Project over the River Jumuna (Detailed Design, Bid Assistance and Construction Supervision)

ddc
ISO 9001:2015 QMS Certified Company

DEVELOPMENT DESIGN CONSULTANTS LIMITED

"DDC Centre" 47, Bir Uttam AK Khandakar Road, Mohakhali C/A, Dhaka-1212, Bangladesh
PABX: Auto Hunting, Pilot Nos. +880-2-58810365, 222295303, Fax: +880-2-58810337, E-mail: ddcon@bangla.net
Website: www.ddclbd.com

M/S BACHU TRADERS

1st Class Govt Contractor Manikganj

১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা।

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বাড়ছে বিদ্যুৎ হচ্ছে উন্নয়ন গড়ছে বাংলাদেশ

হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট, হরিপুর, নারায়ণগঞ্জ।

সিদ্ধিরগঞ্জে স্কুল ভবনের ছাদে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

সিদ্ধিরগঞ্জ ২১২০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

জাতীয় উন্নয়নে মানসম্মত বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইজিসিবি লিঃ অঙ্গীকারবদ্ধ

ELECTRICITY GENERATION COMPANY OF BANGLADESH LTD.
EGCB
ISO 9001, 14001, 45001

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি)
ইউনিক হাইটস (লেভেল-১৫ ও ১৬), ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১২১৭।
www .egcb.gov.bd; mail: info @ egcb.com.bd

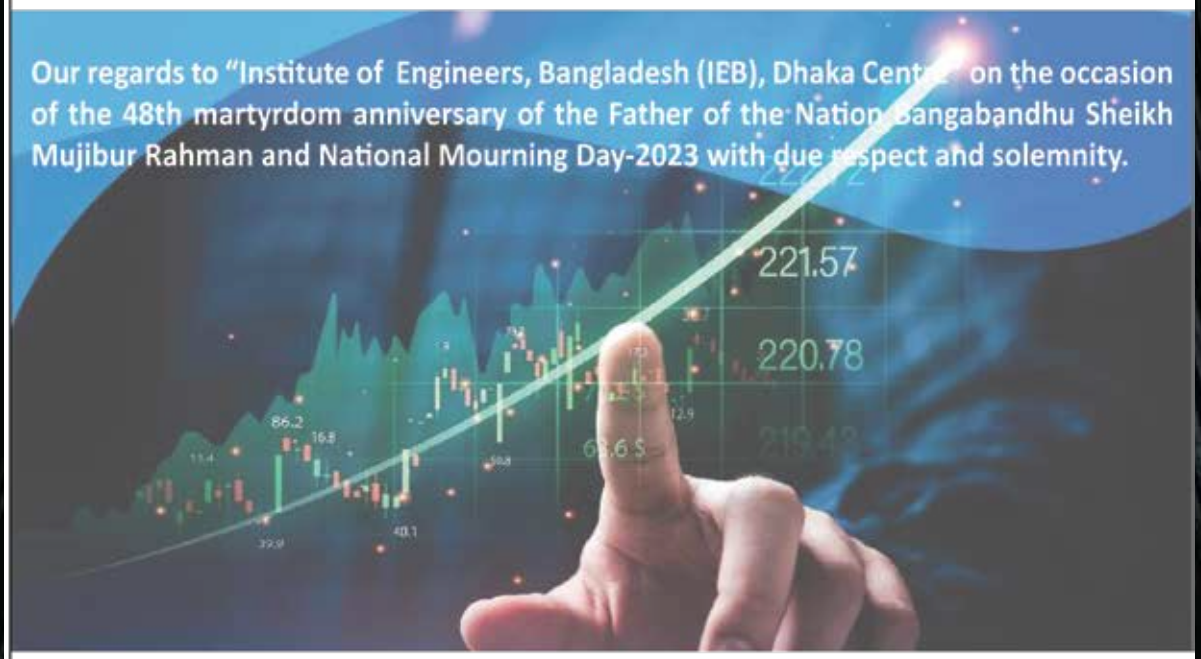

MIR SECURITIES LTD.
DSE TREC NO. 264, BSEC REG No.-587
Our regards to "Institute of Engineers, Bangladesh (IEB), Dhaka Centre" on the occasion of the 48th martyrdom anniversary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Mourning Day-2023 with due respect and solemnity.
221.57
220.78
Office Address: 430/1, Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208, Bangladesh
Phone :+0255138529,55138533-35, Email:securitiesmir@gmail.com

১৫ আগস্ট
জাতীয় শোক দিবস
M/S JOY TRADERS
164/J R.K Mission Road, Dhaka.

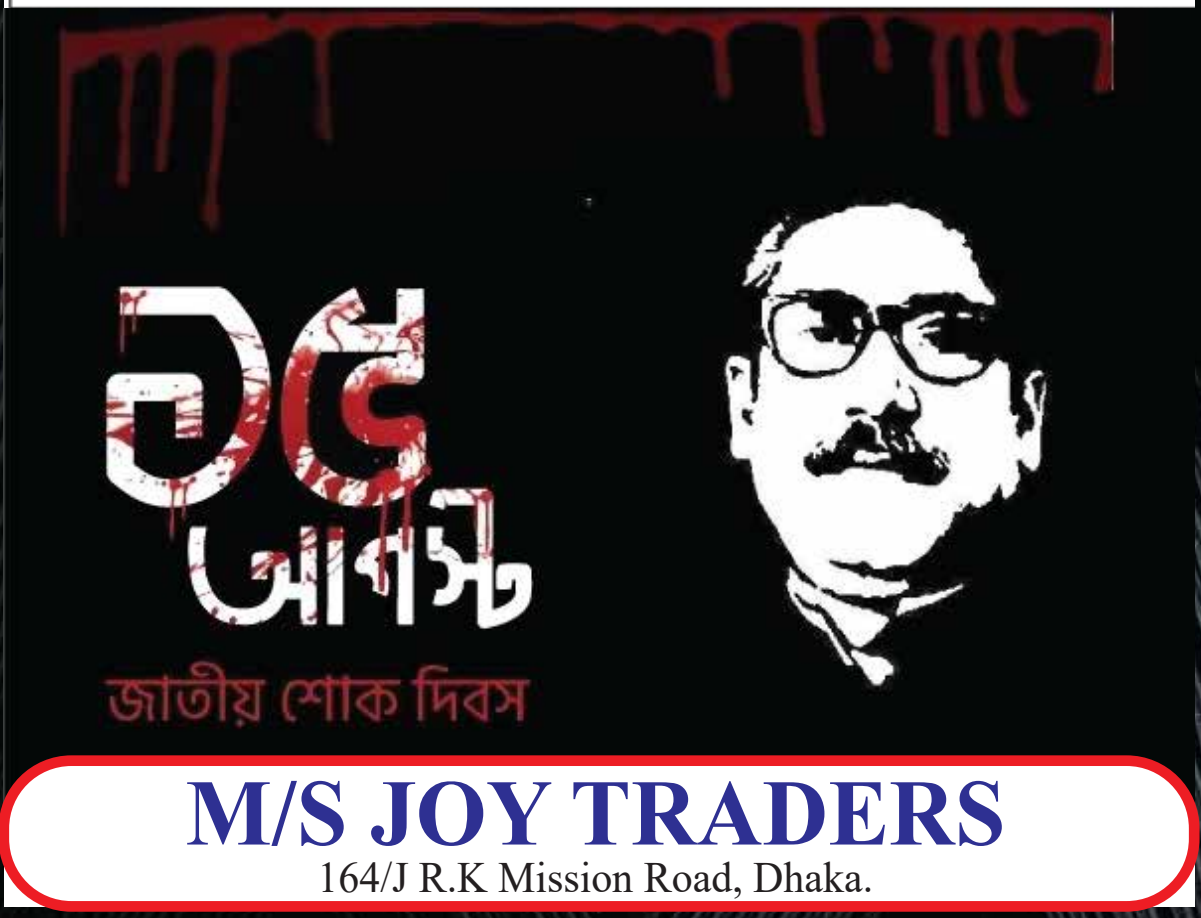

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান

ও ১৫ আগস্টের শহীদদের প্রতি

গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

আলাপ
ইন্টারনেট টেলিফোন
কলিং ও ইন্সট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপ
আলাপ অ্যাপ এর মাধ্যমে
অ্যাপ টু অ্যাপ অডিও, ভিডিও কল এবং চ্যাট
একদম ফ্রি
অন্যান্য অপারেটরে কলরেট মাত্র
৪০
পয়সা/মিনিট
আলাপ অ্যাপ ডাউনলোড করুন
গুগল প্লে-স্টোর
অ্যাপ স্টোর
web.alaap.gov.bd
আলাপ ওয়েব
ল্যাপটপ বা পিসি থেকেই যেকোন অপারেটরে কল
সিকিউরড লগইন
ব্রাউজার থেকে সহজেই ব্যবহার করা যায়
BTCL
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড
www.btcl.gov.bd

North-West Power Generation Company Limited

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

Market Share

- ✓ **3063 MW** generation capacity.
- ✓ Highest among all govt. companies.

09 Power Plants, Total: 3063 MW

Start of Electricity Sales

- ✓ COD of 1st Power Plant

2012

2023

Contributed 14% of Country's total Generation in FY 2021-22

Commencement of Business

- ✓ Started with 02 development projects.

2009

15 Years Journey of Success

2007

Registration & Incorporation

NWPGCL

Enlightening Life
Enlightening Bangladesh

ISO

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 certified

Mujib Corner, NWPGCL

Power Plants of NWPGCL & its JVC

আগস্ট এলেই আঁখিজলে
কেঁদে ওঠে প্রাণ
গগনজুড়ে ভেসে আসে
মুজিব হারানোর গান
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও
১৫ আগস্টের সকল শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি
আলো
১৯৭৫
আদর্শ
শেখ মুজিব
বাংলাদেশ
সোনার বাংলা মুক্ত
-বঙ্গবন্ধু
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)
গ্রাহক সেবাই ডিপিডিসি'র মূল লক্ষ্য, নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎফুল্ল গ্রাহক

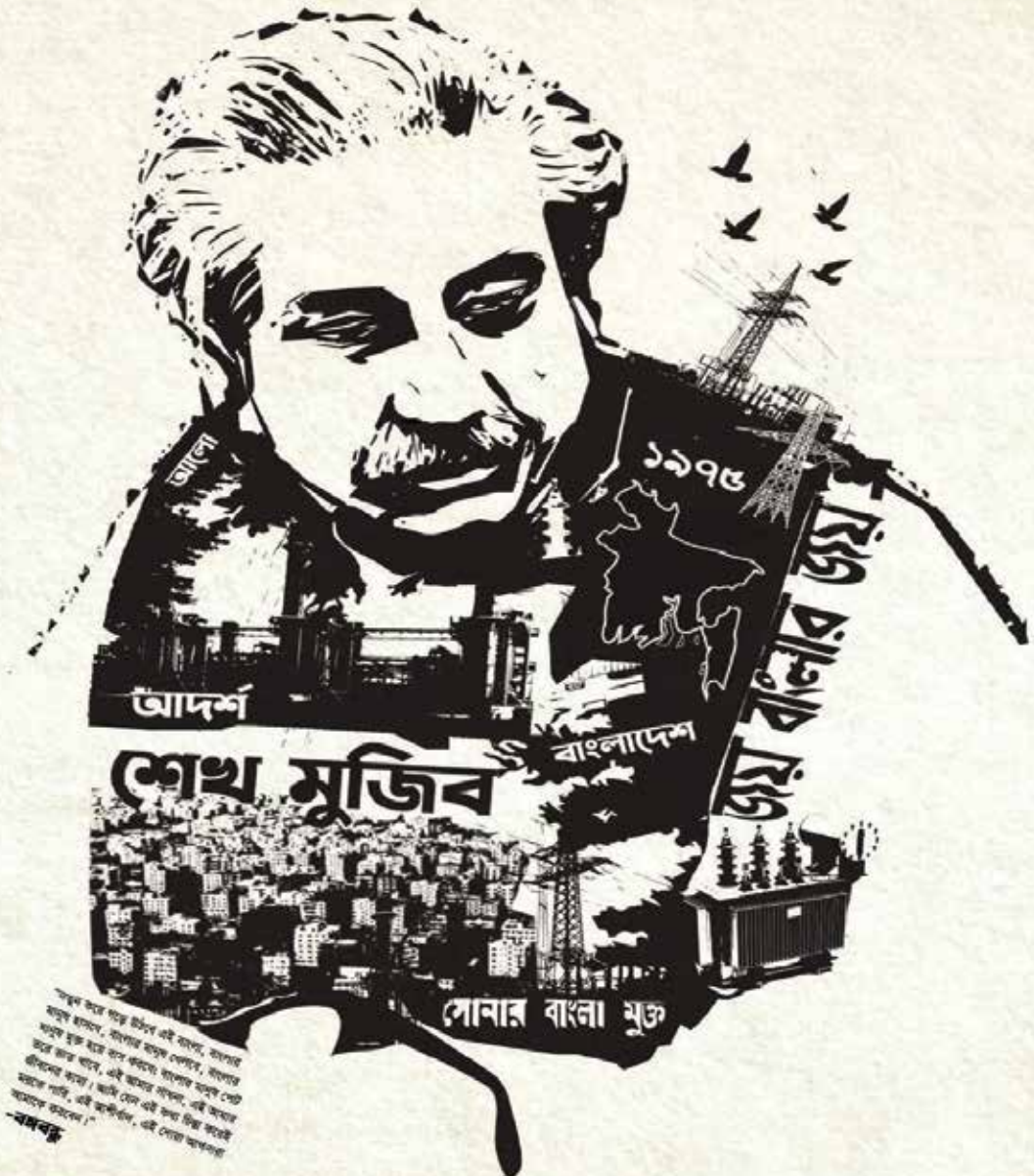

১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা।

Shanti Corporation
The best way to build

53/B, Road # 10, PC Culture Housing Ltd.
Shekhertek, Adabor, Dhaka-1207
+8801722404501
shanti.corporation06@gmail.com

Nidec
All for dreams
Nidec Elevator- making industrial history for over 100 years

DSK
DESENK
Liftting Unlimited Opportunity

International
Japanese Brand
Elevator & Escalator

Think Elavator, Think Nidec

DBC Systems Ltd.
The Divine Solution

House # B-153 (3rd Floor), Road # 22, New DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206. Tel: +880 2224415435,
Cell: 0 1715-711479, 0 1712-256559, Email: dbclifts.mkt@gmail.com, Web: www.dbcsystemsltd.com

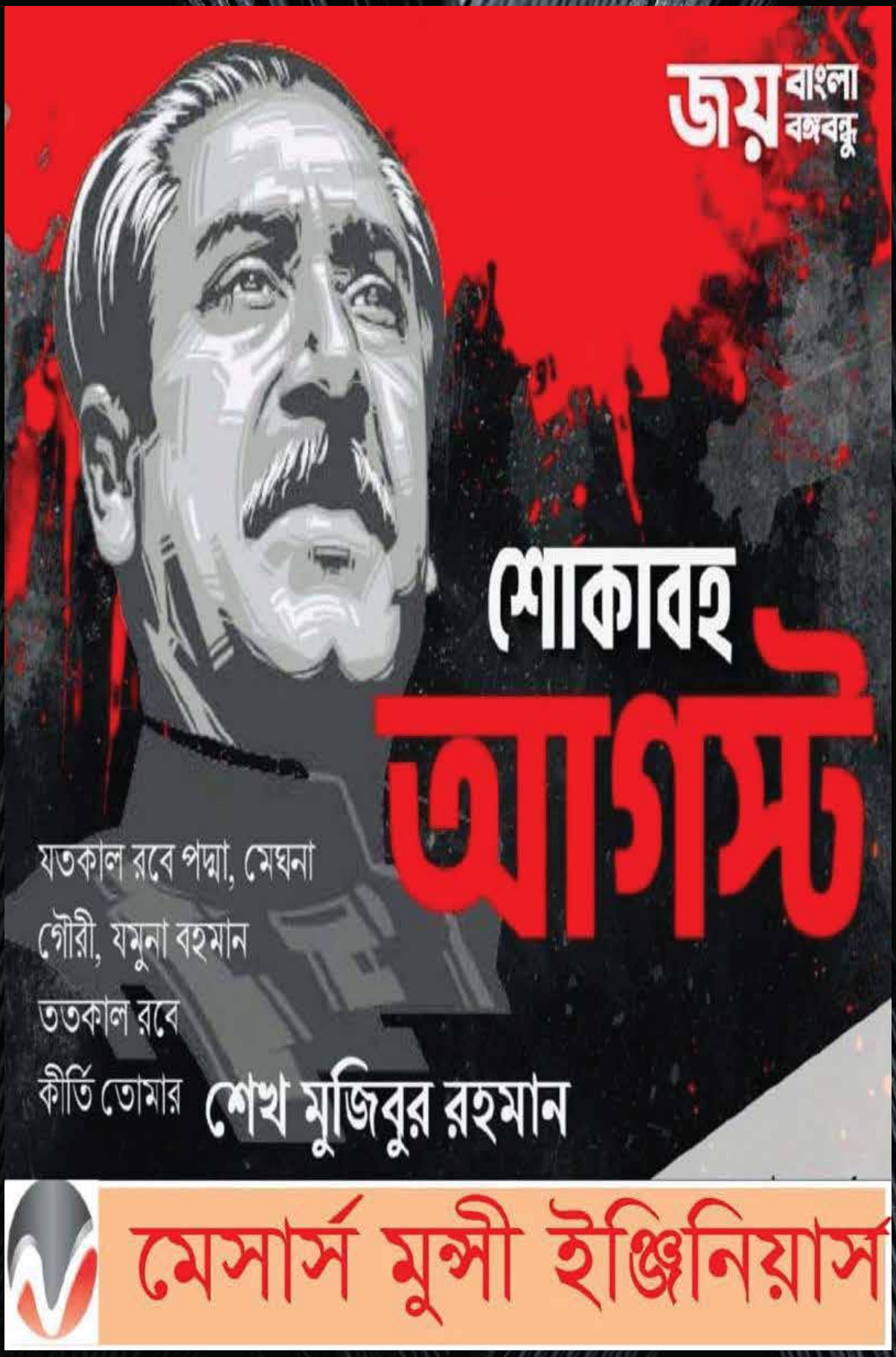
জয় বাংলা
বঙ্গবন্ধু
শোকাবহ
আগস্ট
যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা
গৌরী, যমুনা বহমান
ততকাল রবে
কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান
মেসার্স মুন্সী ইঞ্জিনিয়ার্স

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

E S L ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস লিঃ

E E C দি ইষ্টওয়ে ইলেক্ট্রিক কোং

পি ইউ এল টাওয়ার, প্লট নং- ২৯, লেভেল -৪, গাউছুল আজম এভিনিউ, উত্তরা, ঢাকা - ১২৩০।
ফোন ঃ ৫৫০৯৩৫৫১, ৫৫০৯৩৫৫২। ই-মেইল ঃ eastway@pul-group.com, esl@pul-group.com
কানাডা অফিস ঃ ফোন- ০০১ ৯০৫৪৮৭৪৮৫৭। কুয়েত অফিস ঃ ফোন - ৪৭৪৯০৩১, ফ্যাক্স ঃ ৪৭৪৯০৩১।

Bangladesh Power Development Board (BPDB)

An Organisation of Excellence

Vision

To deliver uninterrupted quality power to all.

Mission

To secure continuous growth of electricity for sustainable development and ensure customer satisfaction.

Objective

- To be engaged in implementing the development program of the government in the power sector;
- To adopt modern technology and ensure optimum utilization of the primary and alternative source of fuel for sustainable development of power generation projects;
- To purchase power as a Single Buyer from power producers;
- To provide reliable power supply to customers enabling socio economic development;
- To promote a work culture, team spirit and inventiveness to overcome challenges;
- To promote ideas, talent and value systems for employees.

Bangladesh Power Development Board

Ref: 02 BPDB/PR, Dated: 09/08/2023

বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ

B-R Powergen Limited

(A Government Power Generation Company)

Head Office
IEB Bhaban (8th floor), 8/A Ramna, Dhaka-1000
E-mail: info@brpowergen.gov.bd
Web: www.brpowergen.gov.bd

(Kodda 150MW Power Plant)

(Mirsarai 150MW Dual Fuel (HFO/Gas) Power Plant)

Existing Power Plant:

1. Name: *Kodda 150MW Power Plant*
Location: *Kodda, Gazipur*
Commercial operation: *16 August, 2015.*

2. Name: *Mirsarai 150 MW Dual Fuel (HFO/Gas) Power Plant.*
Location: *Mirsarai Economic Zone, Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar, Mirsarai, Chattogram.*
Commercial operation: *01 May, 2023.*

Ongoing Project:

1. Name: *Sreepur 150 (±10%) MW HFO based Power plant Project.*
Location: Borma, *Sreepur, Gazipur.*
Date of Commencement: *December, 2021*
Expected Date of Completion: *December, 2023*

Upcoming Projects:

1. Name: *Madarganj 100 MW Solar Power Plant Project.*
Location: *Madarganj, Jamalpur*

2. Name: *Mymensingh 400 MW Gas/LNG Based Combine Cycle Power Plant.*

Future Projects Plan:

Moheskhali 620X2 MW Coal based Power Plant

Embrace the Power

ideal.electrical.ent.ltd.bd@gmail.com
PABX: +880241031153

Ideal Electrical
Enterprise Ltd.

We are expertise in

— Medium Voltage Substation
— Pre payment/Smart Prepayment Meter with System
— Unified Prepayment metering System
— Data Centre
— Disaster Recovery Centre

Address: Rupayan Trade Centre
114, Kazi Nazrul Islam Avenue,
8th Floor, Banglamotor,
Dhaka-1000, Bangladesh.

১৫ আগস্ট

জাতীয় শোক দিবস ২০২৩

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান

ও ১৫ আগস্টের সকল শহীদের প্রতি

গভীর শ্রদ্ধা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ

রহনপুর-মনাকষা ৪০০ কেভি লাইন
(আদানী বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে
বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে)

মেঘনাঘাট-আমিনবাজার ৪০০ কেভি লাইন

মেঘনাঘাট ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র

আমিনবাজার ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ
পিজিসিবি ভবন, এভিনিউ-৩, জহুরুল ইসলাম সিটি
আফতাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।

RURAL POWER COMPANY LIMITED

Committed to enhance socio-economic development in rural areas of Bangladesh through reliable power generation

Rural Power Company Ltd. (RPCL) was registered as a Public Limited Company from the Registrar of Joint Stock Companies & Firms on 31 December 1994 to alleviate severe power crisis of the Country. The Company was promoted by BREB and 5 (Five) Palli Biddyut Samities (PBSs) initially. The Company is presently generating 392 MW of Electricity from its 4 (Four) Power Plants namely- 1) Mymensingh 210 MW Combined Cycle Power Station 2) Gazipur 52 MW Dual-Fuel Power Plant 3) Raozan 25 MW Dual- Fuel Power Plant & 4) Gazipur 105 MW HFO Fired Power Plant. Present Shareholders of the Company are BREB & 17 PBSs.

Mymensingh 210MW Power Station

Gazipur 52MW Dual-Fuel Power Plant

Raozan 25 MW Dual-Fuel Power Plant

Gazipur 105MW HFO Fired Power Plant

1. Mymensingh 210 MW Combined Cycle Power Station:

RPCL has been generating 210 MW of electricity from Mymensingh Power Station (MPS) at Shambhuganj, Mymensingh. MPS, in Phase-I, installed 70 MW Gas Turbine (GT) Generator, Commissioned in July 2000, in Phase-II, installed another 70 MW Gas Turbine (GT) Generator, Commissioned in April 2001 and in Phase-III, installed 70 MW Steam Turbine Generator (STG), Commissioned in July 2007. Presently Mymensingh Power Station is a Combined Cycle Power Plant with a capacity to generate & supply 210 MW of electricity to the National Grid.

2. Gazipur 52 MW Dual-Fuel Power Plant:

To expand the Company's operational capacity and busines, RPCL constructed 52 MW Dual-Fuel Power Plant at Kadda, Gazipur. The plant has started its commercial operation in July, 2012.

3. Raozan 25.5 MW Dual-Fuel Power Plant:

To meet severe power crisis of the country, Government has taken short, mid and long term initiatives. As a part of these initiatives, RPCL has constructed 25.5 MW Dual-Fuel Power Plant at Raozan, Chattagram. The plant has started its commercial operation in May, 2013.

4. Gazipur 105 MW HFO Fired Power Plant:

By the Directives of Power Division, MoPEMR, the Company has established 105 MW HFO Fired Power Plant at Kadda, Gazipur. The plant has started its commercial operation in May, 2019.

Joint Venture Companies of RPCL : There are 03 (Three) joint venture companies of RPCL as follows:

i) B-R Powergen Ltd.:

B-R Powergen Ltd. is a joint venture Company of BPDB and RPCL and it has successfully set up 150 MW Dual Fuel Power Plant at Kadda, Gazipur and started commercial operation in August 2015.

ii) Bangladesh Power Equipment Manufacturing Company Ltd. (BPEMC):

RPCL has established a Smart Prepaid Meter Assembling & Electrical Equipment Manufacturing Company named- Bangladesh Power Equipment Manufacturing Company Ltd. (BPEMC) at Tongi, Gazipur joint venture with Shenzhen Star Instrument Co. Ltd., (Star Instrument), China. The Company already started its commercial operation in 2020.

iii) RPCL-NORINCO Intl. Power Ltd. (RNPL):

RPCL-NORINCO Intl. Power Ltd. is a joint venture Company of RPCL and Norinco International Cooperation Ltd., China. The Company is going to establish Patuakhali 1320 (660X2) MW Coalfired Thermal Power Plant at Dhankhali, Kalapara, Patuakhali.

On-Going Power Generation Projects: In line with the Government's Power System Master Plan, RPCL has undertaken strategy to enhance its generation capacity up to 2730 MW by 2030. The Company has taken steps to install 1320 MW Coal based Power Plant at Kalapara, Patuakhali, 420 MW Dual Fuel (Gas/HSD) Combined Cycle Power Plant (CCPP) at Shambhuganj, Mymensingh and Madarganj 100 MW Solar Power Plant Project at Jamalpur.

Corporate Office: House # 19, Road # 1/B, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka -12030
PABX : 02-48957952, FAX: 02-48963229, Web: www.rpcl.gov.bd

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের শহিদ সদস্যদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা

আহসান হাবিব অরুন
প্রোঃ মোঃ আহসান হাবিব
হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর

মেমার্স অনন্ত ট্রেডার্স
প্রোঃ মোঃ হুমায়ুন কবির
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর

মেসার্স জাকির এন্টারপ্রাইজ
প্রোঃ মোঃ জাকির হোসেন
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর

মেসার্স কাজি এন্টারপ্রাইজ
প্রোঃ মোঃ আলমগীর কাজী
সদর, চাঁদপুর

মেসার্স জাহাঙ্গীর এন্টারপ্রাইজ
প্রোঃ জাহাঙ্গীর
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর

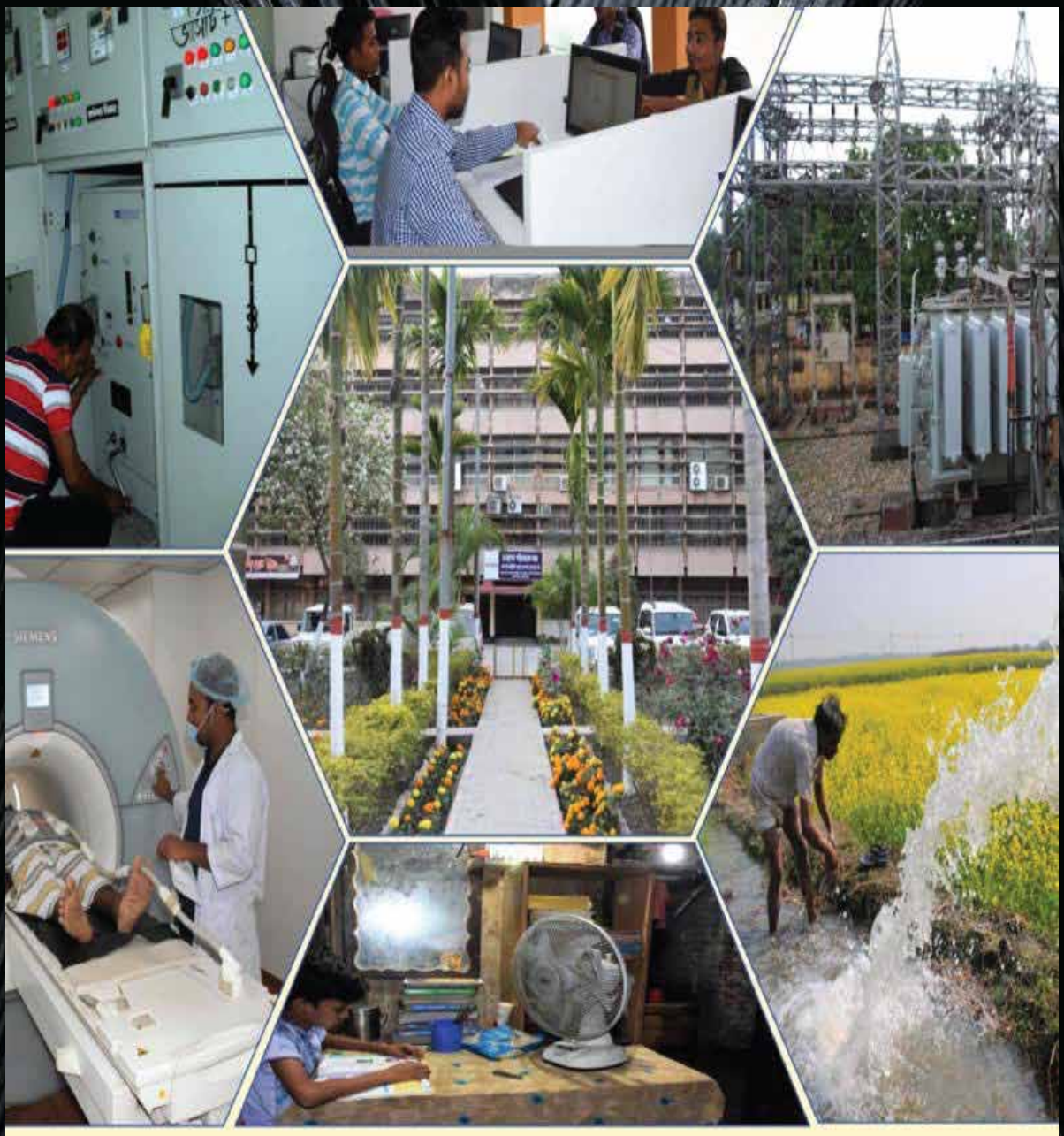

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬ টি জেলায় বিদ্যুৎ বিতরণের গর্বিত অংশীদার

বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন

অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার একটি দন্ডনীয় অপরাধ

নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন

নেসকো সর্বদা আপনার সেবায় নিয়োজিত

NESCO নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি

(বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান)

www.nesco.gov.bd

SEVEN RINGS CEMENT
FOUNDATION FOR FUTURE
SEVEN RINGS CEMENT
is the Principal Cement of
Hazrat Shahjalal International Airport
Third Terminal construction
SEVEN RINGS CEMENT
PORTLAND COMPOSITE CEMENT
SEVEN RINGS CEMENT
SEVEN CIRCLE (BANGLADESH) LIMITED
Made in Bangladesh
50 KG
ISO
SEVEN RINGS

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বিদ্যুৎ সমস্যা ?

No Tension

সমাধান
আপনার মোবাইল ফোনে

ডেসকো'র
মোবাইল অ্যাপস
ব্যবহার করে সেবা নিন

- অনলাইনে ডেসকো'র বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ
- বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত সকল তথ্য
- মাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য
- নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত সেবা
- নিকটস্থ সেবা কেন্দ্রের ঠিকানা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুগল ম্যাপে প্রদর্শন
- বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনে কল বাটনে চেপে সরাসরি অভিযোগ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন
- মতামত/প্রতিক্রিয়া ই-মেইল বা মোবাইলে প্রেরণ

DESCO
POWER IS YOURS

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড

ডেসকো'র সেবা পেতে
কল করুন ১৬১২০

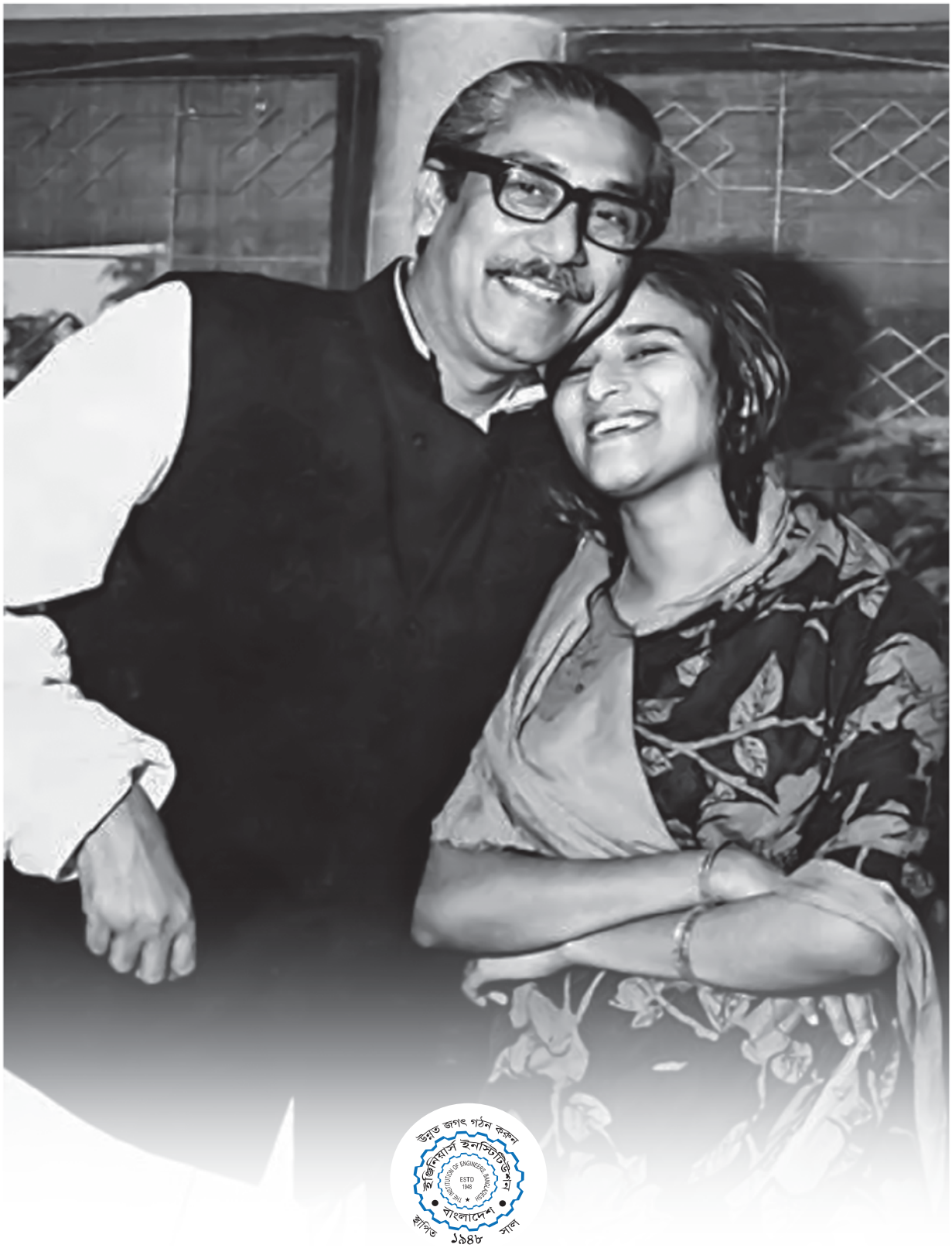

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র

শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০২২২৩৩৮৯৪৮৫, ০২২২৩৩৮৭৮৬০, ০২২২৩৩৮২৪৪৭, ০২২৩৩৮৬৩৩৬

ফ্যাক্স : ৮৮-০২২২৩৩৮২৪৪৭

info.iebhq@gmail.com www.iebbd.org